# স্বপ্নভঙ্গ

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধাণ সরণি কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : কার্ত্তিক ১৩৭১

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭।এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬

## প্রথম পর্ব

'আপনি চেষ্টা করলে আমার ঘর ভাঙত না। আপনার চেষ্টার অভাবে আমার ঘর ভেঙ্গে গেল।' অপরিচিতা যুবতী আমার কাছে সরাসরি অভিযোগ করল।

সকাল বেলা ঘরে বসে কাগজ পড়ছি। এমন সময় মেয়েটি এল, নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে তাকে বসতে বললুম। সে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি ব্যাপার?'

মেয়েটি বিনা বাক্য-ব্যয়ে ঐ অভিযোগ করল। আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'তার মানে? আমার জন্যে তোমার ঘর ভাঙল? আমি—আমি ত—?'

'তোমায় চিনতে পারছি না' কথা কেড়ে নিয়ে মেয়েটি বলল। 'ভাল করে আমায় দেখুন ত, চিনতে পারেন কি না।'

আমি তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম। ঈষৎ গোল ঢলঢলে মুখ, চোখ দুটি বড় বড়, চোখের কোলে বোধহয় একটু কাজল টানা আছে, তার আবেষ্টনীতে বাদামী তারা দুটি যেন প্রাণবন্ত, উচ্ছল, ঠোঁট দুটি একটু পুরু কিন্তু আকর্ষক, গায়ের রং মাজা। চিক্কণ কেশ তৈলাক্ত, সিঁথিতে সিন্দুর নেই। হাল্কা নীল শাড়ী তার যৌবন-পুষ্ট দেহকে সম্পূর্ণ গোপন করতে পারছে না। মেয়েটি সুশ্রী।

'এখনও চিনতে পারলেন না?' যুবতী বলল। 'অথচ আমায় কতবার দেখেছেন। আপনাদের ক্লাবে আমি কয়েকবার অভিনয় করেছি।'

'আমি ত রিহার্সালে বড় একটা যাই না। ষ্টেজের ওপর তোমায় দেখে থাকলে মেক্-আপ্ ছাড়া চেনা শক্ত।'

'তা সত্যি।' মেয়েটি ঈষৎ হেসে বলল, 'আমি মালতী মিত্র। এবার চিনেছেন?'

'হাঁ, হাঁ, আর বলতে হবে না।' আমি বললুম, 'আমার শহরতলী নাটকে রূপসীর পার্ট করে তুমি জমিয়ে দিয়েছিলে।'

এইবার মনে পড়ল মালতী মিত্রের কথা। আমাদের ক্লাবের 'নাট্যাচার্য' বেণীদার কাছে তার সম্পর্কে দু'চার কথা শুনেছিলুম। শৌখিন দলে অনেক মেয়ে নিয়মিত অভিনয় করে। দক্ষিণাও নেয়। মালতী সেই দলে।

বেণীদাই ওকে কোথা থেকে যোগাড় করেছিলেন। নিজেই তালিম দিয়ে ওকে তৈরী করে নিয়েছিলেন। মালতী নিয়মিত রিহার্সালে আসত, কোনও বেচাল করত না. নিজের কাজ সেরে বাড়ী ফিরে যেত, তার হাবভাবে এমন একটা সহজ গাম্ভীর্য ছিল যে সহজে তার সঙ্গে কেউ ফস্টিনস্টি করতে যেত না। বেণীদা এ জন্তে ওর ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। ওকে হঠাৎ ওই শক্ত পার্টটা দেওয়ার অন্য মেয়েদের একটু হিংসে হয়েছিল, কিন্তু বেণীদা তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। দরিদ্র, রুগ্ন, গাঁজাখোর স্বামীর সামনেই রূপসী স্বামীর মনিবের সঙ্গে ঘর করছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ওপর তার একটা টান রয়েছে, যদিও এসব সত্ত্বেও সে গোপনে এক ফুটবল খেলোয়াড় যুবকের সঙ্গে প্রেম করছে। এই রকম একটা জটিল অথচ উচ্ছল চরিত্র নতুন একটি অভিনেত্রীকে দেওয়া দুঃসাহস হলেও বেণীদা দ্বিধা করেননি। আর মালতীও তাঁকে ডুবিয়ে দেয়নি। সে অভিনয় আমি দেখেছিলুম, তার প্রাণবন্ত অভিনয় নাটকটিকে জমিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু পর্দার আড়ালে সেদিন যে ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা পরে বেণীদা আমায় ফাঁস করে দেন। তাতে মালতীর চরিত্র কিছুটা জানা যায়।

স্বামীর মনিব করালীচরণ, যার সঙ্গে রূপসী ঘর করছিল, সেই পার্টটা করছিল কেশব দত্ত। কেশবের চেহারা মহিষের মত। কিন্তু আসলে সে খুব শৌখিন। মার্চেণ্ট অফিসে ভাল কাজ করে। অভিনয় তার নেশা। বোনাস আর ওভারটাইমের টাকা সে অভিনয়ের পিছনে দুহাতে খরচ করে। চেহারাটা তার মোটেই হীরো হবার নয়, তাই সে ভিলেন সাজে। অভিনয় মন্দ করে না। শুধু আমাদের ক্লাবে না, অন্য অনেক জায়গায় সে সারা বছর ধরে অভিনয় করে। এমেচার মহলে তার বেশ নামডাক আছে, এ নিয়ে তার বেশ কিছু দম্ভ। অনেক মেয়ের সঙ্গে সে অভিনয় করেছে। কিন্তু হঠাৎ এই নবাগতা অভিনেত্রী মালতীর সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে সে যেন একটু বেসামাল হয়ে পড়ল। রিহার্সালে প্রেম করতে গিয়ে সে যেন সত্যিই মালতীর ওপর বিশেষ টান অনুভব করল। প্রথমটা কেউ বুঝতে পারেনি। মহলা দিতে গিয়ে একটু রাত হলে কেশব মালতীকে পৌছে দিয়ে আসতে চাইত। কিন্তু

মালতী তাকে এড়িয়ে চলত। একদিন সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি। অঝোরে জল ঝরতে লাগল। অল্প সময়ে রাস্তায় জল জমে গেল। সেদিন রিহার্সাল জমল না। বৃষ্টি থামতে সবাই বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যস্ত। রাস্তায় থই থই জল। পথে নামলে প্রায় কোমর অবধি ভিজে যাবে। মালতী সেই জলের মধ্যেই বাড়ি যেতে চাইল। বেণীদা কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেশব বলল, 'কুছ পরোয়া নেই, আমি একটা রিকশা ডেকে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি।' সেদিন অবশ্য মালতী আপত্তি করেনি।

তার পরদিন ক্লাবে তুমুল কাণ্ড। মালতী রিহার্সাল দিতে আসেনি। এল প্রসাদ বলে একজন যুবক। বেশ ব্যায়াম করা শরীর। সে এসে বেণীদার কাছে খুব হৈ চৈ শুরু করল। 'ব্যাপারখানা কি?' বেণীদা জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রসাদ বলল, 'আপনারা ভদ্দরলোক নয়, ছোটলোকের বেহদ্দ।'

ক্লাবের আরও দু'একজন সভ্য তেরিয়া হয়ে উঠলো। বেণীদা তাদের সামলে নিলেন। প্রসাদ বলল, মালতী আর অভিনয় করতে আসবে না।'

'কেন? কেন?'

'জিজ্ঞেস করুন আপনাদের ঐ কেশববাবুকে।' প্রসাদ বলল, 'সিল্কের পাঞ্জাবি আর কোচান ধুতি পরলেই ভদ্দর লোক হয় না।'

কেশব দত্ত তখনও আসেনি। বেণীদা বললেন, 'আহা, প্রসাদ, তুমি অত রাগছ কেন? ব্যাপারখানা কি হল, তাই বল।'

'বলব কোন্ মুখে?' প্রসাদ রেগে উঠল, 'কাল আপনাদের ঐ কেশব দত্ত রিকশার মধ্যে মালতীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে গিয়েছিল। মালতী রিকশা থেকে লাফিয়ে পড়ে এক কোমর জল ভেঙ্গে বাড়ি যায়। থিয়েটার করতে এসেছে বলে কি, সে মানসম্ভ্রম সব খোয়াবে?'

বেণীদা কিন্তু হয়ে বললেন, 'এ কথা যদি সত্যি হয়ত ভারী অন্যায়। আমি কেশবকে বারণ করে দেব। এমন করলে আমাদের ক্লাবের বদনাম রটে যাবে।'

প্রসাদ আস্ফালন করে বলল, 'আপনি বারণ করবেন কি? আমি শায়েস্তা করে দেব। প্রসাদ পালকে এখন চেনেনি ঐ কেশব দত্ত। মুচিপাড়া থানার মাস্তানদের খাতায় আমার নাম আছে। ও সি আমায় ভালো রকম জানে! আমি তাদেরই তোয়াক্কা রাখি না, তো ঐ কেশব দত্ত। সাইকেলের চেন মেরে টেংরি ট্যারা করে দেব।'

বেণীদা বললেন, 'আমি, ভাই, কেশবের হয়ে মাপ চাইছি। আর এমনটি হবে না। মালতী কখন রিহার্সালে আসবে? ওকে, ভাই, পাঠিয়ে দিয়ো, লক্ষ্মীটি।'

প্রসাদ নরম হল। বলল, 'জলে ভিজে আজ তার সর্দি হয়েছে, গলা বসে গেছে। আজ আর সে আসছে না। পরের দিন সে আসবে।'

'শনিবার ফুল রিহার্সাল, সে যেন নিশ্চয়ই আসে, কেমন?' বেণীদা বললেন।

'আচ্ছা, তাই বলে দেব।' প্রসাদ চলে গেল।

কেশব দত্ত ক্লাবে আসতে সকলে তাকে নিয়ে পড়ল। কেশব আস্ফালন করে বলল, 'বেশ করেছি, যা করেছি। বেটি হাফ-গেরস্ত, তার আবার ফুটুনি দেখ না। অমন ঢের ঢের মেয়েছেলে দেখেছি। আবার মস্তান পাঠিয়ে শাসাচ্ছে। জানে না মন্ত্রীরা আমার এক গেলাসের ইয়ার। বেশী লপচপানি করলে ঐ পেসাদকে মিসায় আটক করে দেব।'

'আর আমাদের থিয়েটারটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে!' বেণীদা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেশববাবু, আপনি ঝানু অভিনেতা, আপনার জানা উচিত যে এই সব গোলমালে আমাদের থিয়েটার ঝুলে পড়বে, হয়ত বন্ধই হয়ে যাবে। এখন এ সব করা কি আপনার উচিত?'

'কি করেছি আমি?' কেশব বলল, 'রিকশায় দুজনে পাশাপাশি বসেছিলুম, গায়ে গা ঠেকেছিল। তলা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, মনটা একটু কাব্যি কাব্যি হয়ে গেল। আপনা হতে দু'চারটে প্রেমের কবিতার লাইন বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। একটা গর্তে রিকশা পড়তে আমার মাথাটা ঝাঁকানি খেয়ে ওর মাথার কাছে এসে গেল। আমি থাকতে না পেরে ওকে একটা চুমু খেয়ে ফেললুম।'

'আহা, খুব মিষ্টি লাগল ত?' কে একজন ফোড়ন কাটল।

'একেবারে বিস্বাদ, মশায়, একেবারে বিস্বাদ।

'কেন, কেন?'

'ঝট্‌কা মেরে মুখটা সরিয়ে নিয়ে পর্দা ঠেলে মেয়েটা ঝপাং করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর আমায় 'অসভ্য, জানোয়ার' বলে, জল ঠেলে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। ভাগ্যে আর কেউ দেখেনি। শুধু রিকশাওয়ালাটা হকচকিয়ে গেল। তাকে বললুম, 'মাঈজীর পেটমে দরদ হুয়া, এই জন্যে তুরন্ত ঘর গিয়া।'

হো হো করে হেসে উঠল কেশব দত্ত নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে।

'শুধু এই ব্যাপার?' কে একজন বলল, 'নিশ্চয় আরও কিছু ঘটেছিল যা আপনি ভাঙছেন না।'

'মাইরি বলছি', কেশব হলপ করে বলল, 'একটু চুমুর বেশি আর কিছু নয়। তাতেই এই শাসানি।'

'যাই হোক্,' বেণীদা বললেন, 'আমাদের থিয়েটার হয়ে যেতে দিন। নইলে কেলেংকারী হবে।'

এসব ঘটনা বেণীদা পরে আমায় বলেছিলেন—আরও বলেছিলেন অভিনয় রজনীর নেপথ্য কাহিনী। আমি তো প্রেক্ষাগৃহে ছিলাম। পর্দার আড়ালে কি ঘটছে, বেণীদা না বললে জানতেই পারতুম না।

কেশব দত্ত সে রাত্রে একটু নেশা করেছিল। তার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অভিনয়ে তার কোনও ত্রুটি হয়নি। স্বামীর সামনেই পরস্ত্রীকে রক্ষিতা রেখেছে, চায়ের দোকানে ঠাট বাজায় রেখে ভদ্রঘরের কুমারী কন্যা অপহরণের ব্যবস্থা করেছে, অথচ তাকে উপেক্ষা করে যুবক খরিদ্দারকে প্রেমিকা মন দিচ্ছে—করালীচরণের এই চরিত্রটি কেশব দত্ত ভালোই ফুটিয়ে তুললো। তার পাশাপাশি চরিত্রহীনা চটুল রূপসী হিসাবে মালতীর অভিনয়ও খুব উতরে গেল। দুজনের জুটি অভিনয়কে জমিয়ে দিল। কিন্তু গোল বাঁধল নেপথ্যে।

কেশব দত্ত অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে মালতীর পিছনে ছোঁক ছোঁক করতে শুরু করল। ছুতো করে মেয়েদের গ্রীণরুমে ঢুকে মালতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে লাগল। বেণীদার চোখে এসব বিসদৃশ লাগলেও তিনি শান্তি রক্ষার জন্যে বিশেষ কিছু বললেন না। কিন্তু থিয়েটারের ড্রপসিন পড়ার পর সে এক কেলেংকারী! কেশব দত্ত স্টেজের একপাশে মালতীকে পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাকে জড়িয়ে ধরে চুমুর পর চুমু খেল। মালতী চিৎকার করে উঠল, জোর করে কেশবের মুখ সরিয়ে দিতে গেল, নখ লেগে কেশবের গাল কেটে রক্ত ঝরে পড়ল। বেণীদা আরও অনেকে গিয়ে ওদের ছাড়িয়ে দিলেন। মালতী ফুঁসতে লাগল।

কেশব ব্যঙ্গ করল, 'ইস্ সতীসাধ্বী মাগী! এই নে তোর চুমুর দাম।' সে এই বলে পকেট থেকে কয়েকটা নোট বার করে মালতীর সামনে ফেলল।

'অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার।' মালতী গর্জে উঠল, 'লাথি মারি তোমার টাকায়।'

এই বলে মালতী হনহন করে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল, মেক-আপ তোলার জন্যে অপেক্ষা করল না। বেণীদা শেষ পর্যন্ত তার জামাকাপড় নিজেই তার বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে এলেন। মালতী তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না। এর পর কে বা কারা একলা পেয়ে কেশব দত্তকে এমন রড মারল, যে তাকে প্রায় সাতদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল।

সেই মালতী মিত্র অভিযোগ করছে আমি তার ঘর ভেঙ্গে দিয়েছি।

মালতী মিত্রের ঘরের ব্যাপার আমি কি করে জানব? বেণীদাও আমায় কিছু বলেন নি। আর আমারই বা কৌতূহল হবে কেন? ক্লাবে অভিনয় করতে কতো মেয়ে আসে, তাদের হাঁড়ির খবর নেবার সময়ই বা কোথায়? কিন্তু কেশব দত্তের কাছ থেকে কিছুটা আভাস পেয়েছিলুম।

কেশব যখন হাসপাতালে, আমি তাকে দেখতে যাই। ভিজিটিং আওয়ার্সে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, সঙ্গে নিলুম কিছু কমলালেবু আর আপেল। শেয়ালদার কাছে হাসপাতাল। এমার্জেন্সিতে সে ভর্তি হয়েছিল। সারি সারি বেডের মাঝখানে কেশবকে খুঁজে পেতে খানিকটা অসুবিধা হলো। তার মাথায় আর হাতে ব্যাণ্ডেজ। আততায়ীরা লোহার রড্ দিয়ে তার মাথায় মেরেছিল। হাত দিয়ে সে বাধা দিতে যায়। মাথায় আর হাতে চোট্ লাগে, তবে আঘাত খুব গুরুতর হয়নি। সে অফিস থেকে বেরিয়ে নিয়মিতভাবে যখন বাড়ির গলিতে পা দিয়েছে, আবছায়ায় কে বা কারা ঘাপটি মেরে ছিল। হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রড্ চালায়। কেশব মাথাটা সরিয়ে হাত তোলে। চোটটা বেশী লাগে হাতে, মাথাটায় আঘাত লাগলেও বেঁচে যায়। রড্ মেরেই আততায়ী হাওয়া। কেশব চিৎকার করেই পড়ে যায়। আশে পাশের লোক ছুটে আসে। তাকে একটা রিকশায় তুলে হাসপাতালে পৌছে দেয়। চিকিৎসা সঙ্গে সঙ্গে হওয়ায় উপসর্গ বাড়তে পারেনি। 'কা'কে সন্দেহ হয়?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম। কেশব বলল 'কি করে জানব? আজকাল গুণ্ডামি তো আকৃচার হচ্ছে। তবে মনে হয় ওটা ঐ মাগীরই কাণ্ড।'

'কার? মালতীর?'

'আবার কার? বেটী হাফ-গেরস্ত। পাড়ার দাদারা ওর গার্জেন। সেদিন এক শালা শাসিয়ে গেল। হয়তো ওদেরই কেউ।'

'থানায় ডায়েরি করেছ ?'

'দূর্, কে আবার হাঙ্গামা পোয়াতে যায় ? এ নিয়ে আবার কোর্ট-কাছারি।'

'তোমার কি মনে হয় মালতী মিত্র ঐ সব গুণ্ডামির পেছনে ?'

'বলা যায় না। বেটি এদিকে লজ্জাবতী লতা। পুরুষ মানুষ ছুঁলেই যেন সতীত্ব নষ্ট হয়। অথচ সেদিন কেমন অভিনয়টা করল ঐ চরিত্রহীন রূপসীর পার্টটায়। ভেতরে কিছু রস না থাকলে ঐ পার্ট কেউ অমন অভিনয় করতে পারে ?'

'তুমি তো রস চাকতে গিয়েই বিপদ্ বাধালে ?'

'তা যা বলেছিস্। মাগী যেন ফোঁস করেই আছে। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। কেশব দত্ত অনেক মেয়েছেলে চরিয়েছে। আমি একদিন এর শোধ তুলব।'

'কিন্তু সত্যি মালতী যদি এই হামলার পেছনে না থাকে ? তুমিই তো বললে গুণ্ডামি আকচার হচ্ছে।'

'তা বটে', কেশব বলল, 'আমার মাথাটা তেমন খেলছে না। আগে সেরে উঠি, তারপর নিজেই তদন্ত করব।'

কেশব তদন্ত করেছিল কি না বা করে কি জেনেছিল, তা আমার জানার ফুরসৎ হয়নি। তবে কথা প্রসঙ্গে বেণীদা একদিন বললেন, 'অমন একটা মেয়ে মালতী মিত্র, এমন তার অভিনয় প্রতিভা. সে কিনা বিয়ে করে এমেচার থিয়েটার জগৎ থেকে অকালে রিটায়ার করল !'

'তাই নাকি ?'

'না কি মানে ? সত্যি।' বেণীদা বললেন, 'এবার একটা বিদেশী নাটক নামাব ভাবলাম। একদম এব্‌স্ট্রাক্ট্ নাটকের রগরগে অনুবাদ। মালতীর খোঁজে গেলুম। শুনলুম সে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে।'

'নিশ্চয় লাভ ম্যারেজ।' আমি বললুম। 'নিশ্চয় কোন শাঁসাল লোকের প্রেমে পড়েছিল. বিয়ের কথাবার্তা ঠিক ছিল, তাই অত সতীত্ব, কেশব দত্তকে অত নাজেহাল।'

'আরে ছোঃ' বেণীদা বললেন, 'প্রেম না ছাই। বাপ-মা বিয়ের ঠিক করেছিল। লোকটা আবার অজ্‌গাঁইয়া। চাষা। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে না কোথায় চাষ-আবাদ করে, বেশ কিছু জমি জিরেত আছে, হালবলদ

গোয়ালে গরু। বিয়ের সময় শুধু নগদ টাকাই নেয়নি, একটা নতুন সাইকেলও যৌতুক নিয়েছে।'

হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন বেণীদা। বললেন 'ভাব তো, তোমার রূপসী ঠাকরুন একটা সাইকেলের কেরিয়ারে টেঁয়চা হয়ে বসেএক চাষার কোমর জড়িয়ে সন্ সন্ করে চলেছে, হাম্বারবের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে, খানা খন্দের পাশে বসে, চাষা মহাশয়ের গলা জড়িয়ে মৃদু মৃদু প্রেম গুঞ্জন করছে—আঃ কি ড্রামাটিক্! চাষার বৌ! নাঃ, ওসব প্যানপ্যানানি আজকালকার দর্শকেরা নেবে না, নইলে তোমায় এই নিয়ে একটা নাটক বাঁধতে বলতুম, ভায়া।'

'তা আপনি এত কথা জানলেন কি করে, বেণীদা? 'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি বিয়েতে নেমন্তন্ন গেছলেন নাকি?'

'না ভায়া, আমার সঙ্গে আর ক'দিনের পরিচয়? আমি ওদের বিশেষ কিছুই জানি না। নতুন নাটকটার জন্যে গেছলুম, ওর খোঁজে ওদের বাড়িতে। ওর বাবাই বড় বড় স্বরে সব বলে ফেললে।'

'তবে যে কেশব বলছিল ওরা হাফ্-গেরস্ত?'

'কি জানি, ভায়া? অভিনয় করাই, এই পর্যন্ত। আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না যে ঠিকুজি-কুলুজির খোঁজ নেব। দেখে তো ভদ্রপরিবারের বলে মনে হল। হারু মিত্তির ওর বাবা—নিজেই এসব খবর দিল। লোকটা মনে হল কঞ্জুস। যৌতুকের করকরে টাকা বার করে এখনও গরগর করছে, তাই আমার কাছে ওসব কথা ফাঁস করে দিল।'

'আপনি কি জানতেন যে মালতীর বিয়ের কথা ঠিক ছিল?'

'কি করে জানব? রিহার্সালের ব্যাপার ছাড়া আমার সঙ্গে কোন কথাই হয়নি। আর ওটা আমার স্বভাব নয়। আমি তোমার ঐ কেশব দত্ত নই? তবে বিয়েটা হঠাৎ হয়ে গেল।'

'এত লোক থাকতে মালতী কিনা এক চাষাকে বিয়ে করল?'

'জেন্‌টেলম্যান ফারমার্। লোকটা বেশী লেখাপড়া করেনি, কিন্তু এগ্রিকালচার বোঝে। আজকাল ওতেই পয়সা ভায়া, নইলে আমাদের মতো কলম পিষে কিই বা জোটে বল।'

'মালতী শহর ছেড়ে গাঁয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? এ বিয়েতে ও আপত্তি করল না? ও তো আর কচিখুকি নয় যে বাপ-মার বাধ্য।'

'আরে, ও নিজেই এই সম্বন্ধ মঞ্জুর করেছে। ওর বাবা হারু মিত্তিরের ইচ্ছে ছিল না মেয়েটা গাঁয়ে পচে মরে। কিন্তু মালতী জেদ ধরল ঐখানেই বিয়ে করবে। হারু মিত্তির ঝানু লোক, মেয়ে অভিনয় ভাল করে, নাম করেছে, অল্পসল্প নাচতে গাইতেও পারে, বাপের ইচ্ছে ছিল এখন বিয়ে নয়, ও এই লাইনেই থাক, যদি পরে বরাত খোলে, কোন ফিলিম নবাবের নজরে পড়ে, রূপোলী পর্দায় তারা বনে যায়। কিন্তু মালতীই বাপের সাধে বাদ সাধল। ঐ সম্বন্ধটা আসতেই সে বিয়ে করবার জেদ ধরল। বিয়ে করে শহর ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেল, আর শহরমুখো হবে না এই তার পণ। তার বাপ তো পস্তাচ্ছে, চাষার বৌ হবে বলে কি গাঁটগচ্চা দিয়ে রহিম ওস্তাদকে রেখে গান শিখিয়েছিল, উত্তরস্বরীতে মাইনে গুঁজে নাচে তালিম দিয়েছিল?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় বর পছন্দ হয়েছে মালতীর। নইলে শহরের উত্তেজনা, নাচগান, অভিনয়ের চটক ভুলে লক্ষ্মী মেয়ের মতো সে কনে বৌ সেজে গাঁয়ে গেল?'

'হারু মিত্তির বলছিল জামাই দেখতে মন্দ নয়, রঙটা বেশ কালো, রোদ্দুরে পোড়া, কিন্তু মুখটা ঠিক কেষ্ট ঠাকুরের মতো।'

'তা একালের কেষ্ট রাধাকে মানাবে ভাল,' আমি টিপ্পনী কাটলুম। 'মালতী সুন্দরী গোধনের পরিচর্যা করবে, তার দয়িত সাইকেলের বেল বাজাবে। ননদিনীর ভয় নেই, অবৈধ প্রণয় নয়, অগ্নিসাক্ষী করা বিয়ে। ওরা সুখী হোক্।'

'তাই বল, ভায়া,' বেণীদা বললেন, 'মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। ওর মধ্যে পার্টস আছে। তেজও আছে। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি, সে কেশব ভায়ার দেওয়া করকরে নোটগুলোয় লাথি মেরে চলে গেল। এ লাইনে যারা আসে সকলে তো আর নিজেদের ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু যে অল্প ক'দিন মালতীকে দেখেছি, মনে হয়েছে ও এ জাতের মেয়েই নয়। সত্যি, সুখী হোক্। আমার শুধু দুঃখু, একটা জাত আর্টিষ্ট দপ করে জ্বলে নিভে গেল।'

*　　　*　　　*

ওরা সুখী হোক। সত্যি, সুখী হোক্। এই তো আমি চেয়েছিলুম, চেয়েছিলেন বেণীদা। তবু মালতী মিত্র অভিযোগ করল, আমি চেষ্টা না করায় ওর ঘর ভেঙে গেল।

আমি মালতীকে বললাম, 'আমি তো চেয়েছিলুম তুমি বিয়ে করে সুখী হও, বেণীদাও তাই চেয়েছিলেন, যখন খবরটা তিনি শোনালেন।'

'কিন্তু তা আর হল কই ?' মালতী চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার সুখের ঘর ভেঙ্গে গেল। কিন্তু আপনি একটু চেষ্টা করলে আমার চিড় খাওয়া ঘর জোড়া লাগত।'

'তুমি আবার আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ। কিন্তু সত্যি, মালতী আমি তো বুঝতেই পারছি না, তোমার ঘর ভাঙ্গার কাজে আমার হাত কোথায়।'

মালতী ম্লান হেসে বলল, 'আপনার মনে আছে ঝুমু দাসী ভারসাস্ সহদেব দাস মামলাটা ?'

'আছে বৈকি।' আমি বললাম, 'আমি তো সহদেবের হয়ে ঐ মামলাটা ডিফেণ্ড করি। তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ?'

মালতী বলল, 'আমিই ঝুমু দাসী। মালতী আমার পোশাকী নাম। ঝুমু ডাক নাম। সহদেব দাস আমারই স্বামী—' একটু থেমে সে বলল, 'ছিলেন।'

মামলাটা ছিল রেস্টিটিউশন্ অব্ কনজুগাল রাইটসের। অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামী সহবাসের অধিকার আদালত মারফৎ ফিরে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামী তার জবাবে সে অধিকার অস্বীকার করে। সহদেব ছিল আমার মক্কেল, কিন্তু আমি সে মামলাটা করিনি, আমারই ইচ্ছায় সহদেব মামলাটা চেঞ্জ নিয়ে অন্য উকিলের কাছে যায়। শেষ অবধি মামলাটার খবর আমি রাখিনি।

সহদেবের দাদা নকুল দাস আমার কাছে মামলার কাগজ পত্র নিয়ে আসে। নকুল আমার বন্ধু ব্যারিষ্টার সঞ্জিত দত্তগুপ্তের ড্রাইভার ছিল। সঞ্জিতের সঙ্গে আমি অনেকবার বাড়ি ফিরেছি, নকুল মোটর ড্রাইভ করে নিয়ে গেছে। ড্রাইভার হলেও নকুল বেশ ভদ্র, চালাক-চতুর। কানাঘুষো শুনেছি, ওর কিছু বাইদোষ আছে। নিষিদ্ধ পল্লীতে ওকে গতায়াত করতে দেখা যায়। তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কে আবার মাথা ঘামায় ? আমায় দেখলেই সে এক গাল হেসে এগিয়ে আসে, দু'হাত উঁচু করে প্রণাম করে। লোকটা খুব ওব্লাইজিং।

সে হঠাৎ আমার অফিসে দুপুরবেলা হাজির। সঙ্গে একজন সুবেশ ভদ্র যুবক। তার রঙ খুব কালো, নকুলের চেয়েও দু'পোঁচ হবে। কিন্তু মুখটি সুন্দর, যেন কষ্টিপাথরে খোদাই করা কৃষ্ণমূর্তি।

'কি ব্যাপার নকুল ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'স্যার, অনুমতি না নিয়েই ঘরে ঢুকে পড়েছি।' নকুল বলল, 'বেয়ারার

কাছে শুনলুম আপনি একাই আছেন। তাই গোপনীয় একটা কাজে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি।'

'বেশ, বেশ, বস।' আমি বললুম।

'না স্যার, আপনার সামনে আমি বসব কি?' নকুল বলল, 'যদি অনুমতি করেন, তো আমার ভাই সহদেব বসতে পারে।'

'আমি বলছি তোমরা দু'জনেই বস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কাজের কথা হয়?'

নকুল আর সহদেব দু'জনেই চেয়ারে বসল অত্যন্ত বিনীতভাবে। তারপর নকুল মামলার একটা কাগজ বের করল। পড়ে দেখি সেটি একটি প্লেন্ট্। আদালতের বর্ণনা ও মামলার নম্বর দেবার পর বাদী-প্রতিবাদীর নাম ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী ঝুনু দাসী কলিকাতার ৫ নম্বর বিপিন যশ লেন নিবাসিনী বাদিনী বনাম শ্রীসহদেব দাস, জেলা ২৪ পরগণার থানা হরিপুরের অধীন মুরলা গ্রাম নিবাসী প্রতিবাদী।

বাদিনীর আর্জি মোদ্দা এই যে, কলিকাতার উক্ত ঠিকানায় আইনসঙ্গত-ভাবে বাদিনীর সঙ্গে প্রতিবাদীর বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। সেই বিবাহ কলিকাতায় রেজিষ্ট্রী করা হয়। বাদিনী প্রতিবাদীর বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে উক্ত গ্রামে একত্র বাস করে। উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে কলিকাতায় উক্ত ঠিকানায় সর্বশেষ বসবাস করে। কিন্তু পরে প্রতিবাদী অন্যায়পূর্বক বাদিনীকে পরিত্যাগ করে। বাদিনী স্বামীর সঙ্গে সহবাসের জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত। স্বামীকে সে সহবাসের জন্যে আহ্বান করেছে, কিন্তু প্রতিবাদী অন্যায়পূর্বক এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব বাদিনী আদালতের কাছে বৈবাহিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আবেদন করছে ইত্যাদি।

আরজিটায় কোনও ঘোরপ্যাচ নেই, কিন্তু সেটা লিখেছেন একজন মাতব্বর উকিল যাঁর আইনে দক্ষতা সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান আর দক্ষিণাও মোটা রকমের। একেবারে সহজ আরজি হলে প্রথমেই এতবড় উকিলকে দক্ষিণা দেবার দরকার হত না। বাদিনী গোড়া থেকেই মামলার জন্যে বেশ খরচ করেছে।

'হুঁ', আমি বললুম, 'নকুল, মামলার আরজিটা তো সাদা-মাটা। এখন জবাবটা কি হবে?'

'সেটাই তো আপনাকে বলছি, স্যার।' নকুল বলল। 'আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে মামলাটা লড়তে হবে। আমার সহোদর ভাই, স্যার। সাধাসিধে

লোক। চাষবাস করে। মোটামুটি সংসার চালায়। বেশী খরচাপাতি করতে পারবে না, স্যার। আপনি একটু দয়া করবেন ফীর ব্যাপারে।'

'সে পরে হবেখন', আমি বললুম, 'কিন্তু জবাব লেখাতে তো ফী লাগবে।'

'সে জন্যে ভাববেন না, স্যার,' নকুল বলল, 'আমার সাহেব বলেছেন আপনি কাজটা হাতে নিতে রাজী হলে উনি বিনা ফীতে আমাদের রিটন্ স্টেটমেন্ট লিখে দেবেন। পরে দরকার হলে আদালতে এ পক্ষে দাঁড়াবেন।'

'সে তো ভালো কথা', আমি বললুম, 'এখন জবাবটা মোদ্দা কি?'

'ফ্রড্, স্যার,' নকুল বলল, 'এ বিয়েটা বিলকুল ভাঁওতা দিয়ে হয়েছে। আমার ভাইকে ঠকানো হয়েছে।'

'সে কি! তোমরা কিছুই জানতে না? মেয়ে বদল নাকি?'

'না, স্যার। বিয়ে ওর সঙ্গেই হয়েছে।' নকুল বলল, 'কিন্তু ওর আসল পরিচয় চেপে যাওয়া হয়েছিল। হারাধন মিত্তিরের মেয়ে ঝুনু মিত্তির ইত্যাদি শুনে আমরা ভেবেছিলাম ও ভদ্রঘরের মেয়ে, কিন্তু পরে জানতে পারলুম, ওর মা হলো বাড়িউলি, ময়রাপটির ডাকসাইটে বিন্দি বাড়িউলি, যে ছ' সাতখানা খারাপ বাড়ির মালিক, যার তাঁবে কয়েক ডজন মেয়ে খাটে। এসব জানার পর কি এমন মেয়েছেলেকে ঘরে রাখা যায়?'

সহদেব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার আমতা আমতা করে কথা বলল। তার গলাটিও মোলায়েম। সে বলল, 'মেয়েটার কোনও দোষ নেই, স্যার। কিন্তু সমাজে তো টিকতে হবে। আপনাদের শহরে একরকম। কিন্তু গ্রামে জানাজানি হয়ে গেলে আর তিষ্ঠানো দায়।'

নকুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমার কথা মাপ করবেন, স্যার। ঠিক তাই হয়েছে. গ্রামে জানাজানি হয়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও সুর করে বলছে, খানকির মেয়ে, খানকির জামাই।'

'হুঁ,' আমি বললুম, 'বিয়েটা যখন হলো তখন তোমরা ভালো করে খোঁজ খবর নাওনি?'

সহদেব মুখ বুজে রইল। নকুল একবার ঢোঁক গিলে বলল, 'খোঁজ নিয়ে আমরা জানতে পারিনি, স্যার। হারাধন মিত্রের মেয়ে, বিপিন বশ লেনে থাকে, লেখাপড়া জানে, নাচতে গাইতে পারে, নাকি বাবুদের সঙ্গে থিয়েটারও করে। ও যে বাড়িউলির মেয়ে সে খবর আমরা জানতুম না। মানে—আমাদের কোন সন্দেহ হয়নি। তা ছাড়া বিয়েটাও তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কিনা।'

নকুলের কথা বলার ঢংএ কেমন একটা সরলতার অভাব ছিল। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। কথা বার করবার জন্যে আমি জেরা করতে লাগলুম, 'তুমি বলছ জানতে না। কিন্তু ময়রাপটির ডাকসাইটে বাড়িউলির মেয়ে তো পাড়ায় অচেনা থাকতে পারে না। তুমি পাড়ার লোকের কাছে খোঁজ নিলে পারতে।'

'সেটা বড় ভুল হয়ে গেছে, স্যার।' নকুল বলল, 'সম্বন্ধটা ভালো মনে হল, একেবারে মিত্তির কায়েত, আমরা জাতে একটু নীচু।'

'তাতেই তো সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল,' আমি বললুম, 'হঠাৎ নীচু জাতে কায়েতের মেয়ে বিয়ে দেবে, তার নিশ্চয় কোনও গূঢ় রহস্য আছে।'

'আমরা কি আর আপনাদের মতো আইন জানি, স্যার?' নকুল বলল, 'ওরা বেশ মোটা টাকা যৌতুক দেবে বলল, আমরাও রাজী হয়ে গেলুম।'

সহদেব এবার বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, স্যার, দাদাই ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, ওদের ঘর জামাই হয়ে থাকতে রাজী ছিল। কিন্তু মেয়েটা রাজী হল না।'

'কেন? পাত্র হিসেবে নকুল মন্দ কি?'

নকুল বিরক্ত হয়ে বলল, 'মেয়েটা একটু টেঁটিয়া, স্যার্। বলে ড্রাইভার বিয়ে করব না। আরে মলো, তুই একটা বাড়িউলির মেয়ে, তার আবার দেমাক কত।'

'তার মানে তুমি জানতে সে বাড়িউলির মেয়ে? জেনে শুনে এই বিয়ে হল।'

ধরা পড়ে গিয়ে নকুল হেসে ফেলল, মাথা চুলকে বলল, 'আপনার কাছে জেরায় পারব না, স্যার। সত্যি বলছি আমি জানতুম। কিন্তু আমার ভাই জানত না। আমি দেখলুম এমন শাঁসালো সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই ভাইয়ের সঙ্গে ওকে ঝুলিয়ে দিলুম। ভাইকে ও অপছন্দ করল না।'

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললুম, 'তাই তো ফ্রডের ডিফেন্স একটু কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। জেরার মুখে তোমাদের এই গল্প টিকবে কিনা শক্ত।'

'কিন্তু এদিকে যে আমরা গাঁয়ে টিকতে পারছি না,' নকুল বলল, 'ভাল করে লড়তে হবে, এ বিয়ে কাঁচিয়ে দিতে হবে। আমার জন্যেই যত ঝামেলা। আমি ভাইয়ের আবার বিয়ে দেব।'

সহদেব বলল, 'আমি আর বিয়ে করতে চাই না, স্যার। কিন্তু ওকে নিয়ে গ্রামে তিষ্ঠতে পারছি না। তাই—'

'শহরে বসবাস কর,' আমি বললুম, 'তাই বলে বিয়ে করা বৌকে ত্যাগ করবে?'

'ত্যাগ তো করতে চাই না, স্যার,' সহদেব বলল, 'নিরুপায় হয়ে করছি। একটা বৌয়ের জন্যে ভিটেমাটি ছাড়ি কি করে? অথচ ছোট ছেলেমেয়েরা সুর করে বলছে, খানকির জামাই।'

'সত্যি তুমি তোমার বৌয়ের আসল পরিচয় জানতে না?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

'মা কালীর দিব্যি, আমি জানতুম না, স্যার।' সহদেব বলল, 'দাদা যখন সম্বন্ধ করল, আমি মুখ বুজে বিয়ে করে বৌ নিয়ে ঘরে ফিরলুম।'

'তাইতো, নকুল,' আমি বললুম, 'ব্যাপারটা একটু জটিল আছে। অনেকটা সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করবে। জজ সাহেব কাকে বিশ্বাস করবেন, সেটা গোড়া থেকে বলা শক্ত। ওপক্ষ প্রথম থেকে আঁটঘাট বেঁধে কাজ করছে। বড় উকিলও দিয়েছে। মামলার শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না।'

'আপনি কাগজটা রাখুন,' নকুল বলল, 'আমার সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলে নেবেন। তারপর লড়ে দেখি। সবার ওপরে কপাল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আর কোন কাগজপত্র আছে?'

'কি কাগজপত্র?' নকুল বলল।

'ধর মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে চিঠিপত্র।'

'উকিলের চিঠি আছে। আর আমাদের জবাব।'

'এ ছাড়া—?'

সহদেব একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'খানকতক চিঠি আছে, স্যার। ও আমাকে লিখেছিল। কিন্তু সেগুলো আর কি কাজে লাগবে?'

'লজ্জা করিসনে,' নকুল বলল, 'ডাক্তার আর উকিলের কাছে কিছু গোপন রাখতে নেই। চিঠিগুলো স্যারকে দিয়ে দে যদি মামলায় কাজে লাগে।'

'আমি তো সঙ্গে আনিনি,' সহদেব বলল, 'পরে এনে দেব।'

'বেশ,' আমি বললুম, 'কতদিন সময় আছে জবাব দেবার?'

কাগজ দেখে বললুম, 'নাঃ, এখনও অনেক সময় আছে। সহদেব তুমি ওকালতনামাটা সই করে দাও।'

নকুল বলল, 'আমি সেটা সেরেস্তায় সেরে রাখছি। আর স্ট্যাম্প ইত্যাদি বাবদ কিছু টাকা জমা দিয়ে যাচ্ছি।'

শেষ পর্যন্ত সঞ্চিত দত্তগুপ্ত একটা জবাব লিখল। আমি প্রতিবাদী সহদেবের হয়ে সেটা আদালতে ফাইল করলুম। কিন্তু প্রথম থেকেই মনে মনে সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। মামলায় সাফল্য সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সন্দেহের কারণ হলো স্বামীর উদ্দেশ্যে লেখা ঝুনু দাসীর প্রেমপত্রগুলি। দত্তগুপ্ত বলল, 'ঐ চিঠিগুলি চেপে যাও। ঐ চিঠি পড়লে জজ সাহেব নিশ্চয় প্লেনটিফের পক্ষে ডিক্রি দেবে, কিছুতেই রোখা যাবে না।'

ময়রাপটির বিন্দি বাড়িউলিকে আমি চিনি। বিন্ধ্যবাসিনী দাসী ওরফে বিন্ধ্যবাসিনী মিত্র নিষিদ্ধ পল্লীর একজন সুপ্রতিষ্ঠিতা নেত্রী। অনেকগুলি বাড়ির সে লেসি বা ভাড়াটিয়া। তার অধীনে বহু বেশ্যা রুজিরোজগারের সংস্থান করে। বিন্দিমা বা বিন্দিদি অনেক অভাগিনীর গুরুমা। হারাধন মিত্রের সঙ্গে সত্যি তার বিয়ে হয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করে। বিপিন যশ লেন ঠিক নিষিদ্ধ পল্লীর মধ্যে নয়। একটু বাইরে। তাদের বাড়িতেও ভদ্র পরিবেশ। হারাধন মিত্র সেই বাড়ির কর্তা, বিন্ধ্যবাসিনীর রক্ষকও বটে। পৃথিবীর আদিমতম এই ব্যবসায় একা মেয়েছেলে সামলে উঠতে পারে না। গুণ্ডা-বদমায়েশ আছে, থানা পুলিস আছে, কোর্টকাছারিও আছে। কে এসব হেপা পোয়ায়? তাই একজন রক্ষকের দরকার। হারাধন এই কাজে বেশ পোক্ত। গুণ্ডা-মাস্তানদের সে হাতে রাখে, দারোগা সেপাইদের সঙ্গে তার দহরম-মহরম, উকিল, মোক্তারও তার অজানা নয়। ময়রাপটি অঞ্চলে মিত্র-দম্পতীর বেশ দাপট। এদের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে। কিন্তু মালতী মিত্র ওরফে ঝুনু দাসী যে বিন্ধ্যবাসিনীর মেয়ে সেটা আমার আগে জানা ছিল না। বেণীদা হারু মিত্তিরের নাম করতেও খেয়াল হয়নি।

নির্বাচনের ব্যাপারে আমি কয়েকবার ওদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। গণতন্ত্র বহুস্তরের লোককে কাছাকাছি এনে দেয়। গণিকা বলে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। ভোটার তালিকা খুঁজলে কোন কোন রাস্তায় অসংখ্য মেয়ের নাম পাওয়া যায় যাদের ভোট আছে। তাদের ওপর নির্ভরশীল পুরুষের সংখ্যাও কম নয়। নির্বাচনের জন্যে ওদের মধ্যেও সাময়িক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হয়, তার আগে ও পরে কিছুটা যোগাযোগ রাখতে হয়।

গণসংযোগ থেকে গণিকা সহযোগ—অবশ্য রাজনৈতিক সূত্রে। যদি কেউ তার অতিরিক্ত যায় তো কে বাধা দিতে পারে ?

বিন্ধ্যবাসিনী অর্থাৎ বিন্দিদি নির্বাচনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। তার চেহারাটাও রাশভারী। সে বয়সকালে বেশ সুশ্রী ছিল। এখন মোটাসোটা। লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা টেনে, কপালে টাকা প্রমাণ সিঁদুরের টিপ পরে সে যখন গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে গিয়ে পাড়ার কালীমন্দিরে পুজোর ফুল মিষ্টি উৎসর্গ করে আসে, হঠাৎ দেখলে তাকে কে না ভদ্রঘরের ঘরণী বলে ভুল করবে ? তার ব্যবহারটিও সংযত, ভদ্র। কথাবার্তাও শালীনতাপূর্ণ, কিন্তু গলাটি একটু খন্‌খনে। বিন্দি বাড়িউলির ব্যক্তিত্ব তার প্রভাবের অন্যতম কারণ। এককথায় নিষিদ্ধ পল্লীর সে একজন লীডার। তাকে বাদ দিয়ে ও অঞ্চলে কোনও সার্বজনীন পূজাপার্বণ, যাত্রাগান, উৎসব, রাজনৈতিক সভাসমিতি সম্ভব হয় না। পুলিসের অত্যাচার, ধরপাকড় বাড়লে বিন্দি এগিয়ে আসে, বাড়িউলি আর মেয়েদের সভা ডাকে, প্রস্তাব পাস করায়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে, ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেয়। ঝড়বন্যায় চাঁদা তুলতে হলেও বিন্দি পিছিয়ে থাকে না, নিজে তো মোটা অঙ্কের চাঁদা দেয়ই, আবার কিছু মেয়ে-পুরুষ জুটিয়ে পথে পথে বাড়ি বাড়ি ঘুরে টাকাকড়ি, পুরোনো জামাকাপড়, চালডাল সংগ্রহ করে, হিসেব রাখে, রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সংঘে সংগৃহীত অর্থ ও জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিয়ে রসিদ নিয়ে আসে। মেয়েরা ঝামেলায় পড়লেও বিন্দিমা সাহায্যে মুক্তহস্ত। কিন্তু তাদের বেচাল দেখলে সে অন্য মূর্তি ধরে। কি দিনে, কি রাত্রে মেয়েছেলেরা সাজগোজ করে খদ্দের ধরবার জন্যে গলির মুখে বাড়ির দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেদের মধ্যে হাসিমস্করা করে, কিন্তু পথচারীদের সঙ্গে যদি কেউ অভদ্র ব্যবহার করে তো বিন্দির শাসনের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই, সে তার নিজের ভাড়াবাড়ির মেয়েরাই হোক বা অন্য কোনও বাড়িউলির অধীনেই থাক। বিন্দি এ নিয়ে তোলপাড় করবেই। সে বলে, 'ভদ্দর লোকের ছেলেরা এ পাড়ায় আসে, কত ভাগ্যি ! এখানে বেচাল হলে ভদ্দরলোক আসবে কেন ? পুলিসের ঝুট ঝামেলা বেড়ে যাবে। তখন বিপদে পড়ে 'বিন্দিদি'—'বিন্দিমা'—কত দরদ দেখিয়ে মন গলাতে আসবে থানা-পুলিস কোর্ট-কাছারিতে দৌড়ঝাঁপ করানোর জন্যে। তার চেয়ে ঝামেলার হাত থেকে দূরে থাকাই ভালো। বেলেল্লাপনা করেছিস কি মরেছিস। শেষ অবধি

রুজিরোজগারে টান পড়বে। নিজে তো মরবিই, আবার অন্যদেরও মারবি। বিন্দির জীবনদর্শন খুব বাস্তববাদী।

বিন্দির গণতন্ত্রও বাস্তববাদী। সে একবার এক দলকে, অন্যবার অপর দলকে সমর্থন করে। হিসেব করে দেখে কোন্ দলকে মদত দিলে তার বা তার পল্লীর উপকার হবে। এর ফলে সব দলই বিন্দিকে সমীহ করে. তাকে দলে টানতে চায়। নির্বাচনের আগে পর্যন্ত বিন্দি স্পষ্ট করে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে না।

বিন্ধ্যবাসিনীর অভ্যুত্থান কি করে হল, তার ইতিহাস আমার জানা নেই। এসব জানবার সময়ও আমার ছিল না, কিন্তু মামলার ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর নিতে হল। এই প্রভাবশালিনী প্রৌঢ়া বাড়িউলির অতীত কাহিনী সে নিজে ছাড়া বোধহয় খুব কম লোকই জানে। আমার অনুসন্ধান বিশেষ কিছু এগল না। তবে এটা স্বীকার করতে হল বিপিন যশ লেনে যে ভদ্র পরিবেশে ভদ্রভাবে বিন্ধ্যবাসিনীর ছোট সংসার চলছিল, তাতে সহদেব দাসের মত গ্রাম্য কৃষিজীবী যুবকের পক্ষে প্রবঞ্চিত হওয়া মোটেই আশ্চর্য ছিল না।

অবশ্য তার দাদা নকুল দাসের কথা স্বতন্ত্র। সে নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত করত। বিন্ধ্যবাসিনীর ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড ভালোভাবেই জানত। জেনেশুনে সে বিন্দি বাড়িউলির মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি তাকে প্রত্যাখ্যান করে। শেষ অবধি নিজের সরলমতি ভাইয়ের সঙ্গে নকুল মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।

মালতী্বা ঝুনুর খবর যেটুকু যোগাড় করতে পেরেছিলুম, তা হল এই, যে খুব ডিসিপ্লিনের ওপর সে মানুষ হয়েছে। তার মা বাড়িউলি হলে কি হবে, নিজের মেয়ের ব্যাপারে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পুরসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ে মালতী নিয়মিত পড়ত। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিল। তারপর পড়া ছেড়ে দেয়। বেণীদা তো আগেই জানিয়েছেন, নাচের স্কুলে সে নাচ শিখেছে, গান শিখেছে ওস্তাদের কাছে। শখের থিয়েটারে সে নিজেই যোগ দিয়েছে। এ ব্যাপারে তার মার মহা আপত্তি ছিল, কিন্তু মালতী শোনেনি। যদিও তার টাকা পয়সার অভাব ছিল না, তবু নিজে অভিনয় করে যে কটা সে রোজগার করত, তাতেই ছিল তার আনন্দ।

নকুল দাস এসব খবর দিতে দিতে বলল, 'বিশ্বাস করুন, স্যার, বাড়িউলির

মেয়ে হলে কি হবে, ঝুনু খাঁটি মেয়ে, ওর মধ্যে কোনও পাপ নেই। মেয়ের দিক থেকে কিন্তু আমি আমার ভাইকে ঠকাইনি।'

'তবে তোমরা তাকে ত্যাগ করছ কেন?' আমি বললুম, 'ঘরের বৌকে ঘরে ফিরিয়ে নাও। এ মামলা মিটিয়ে নাও।'

'তা হয় না, স্যার,' নকুল বলল, 'এখন সব জানাজানি হয়ে গেছে। গাঁয়ে আর তিষ্ঠতে পারব না।'

'......বিশ্বাস কর আমি নিষ্পাপ,' মালতীও তার চিঠিতে লিখেছিল, 'তবে তোমরা আমায় ত্যাগ করছ কেন? এ কথা সত্যি আমার মার চরিত্র আজ আর গোপন নেই। আমরা কেউ গোপন করতে চাইনি। তোমার দাদা, আমার ভাশুরঠাকুর তো সবই জানতেন। তিনি যদি তোমাকে না বলে থাকেন সে কি আমার অপরাধ? ফুলশয্যার রাত্রে আমি নিজে তোমায় সব বলেছি। কই তখন তো তুমি আমাকে অপরাধী করনি। আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কানে কানে বলেছিলে, ওসব কথা ভুলে যাও ঝুনু। ওসব কথা কাউকে বলো না। যেন কাকপক্ষীও জানতে না পারে। তার মানে তুমি আমায় ক্ষমা করেছিলে। তুমি আমায় গ্রহণ করেছিলে। তুমি আমায় আদরে আদরে ভরে তুলেছিলে। এতেই আমি গরবিনী। কিন্তু আজ আমার সেই প্রাণের ঠাকুর কোথায়? কেন সে আমায় ভুলে গেছে? কেন সে আমায় ত্যাগ করেছে, কেন, কেন, কেন? কি অপরাধ করেছি আমি?......।'

আর একটা চিঠিতে মালতী লিখেছে, 'লিখতে হাত কাঁপছে, তবু তোমায় লিখছি, কেননা এ কথা তোমার সামনে বলার সাহস হয়নি, হবেও না। তোমার দাদা আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হয়নি। তিনি ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি ড্রাইভারী করেন বলে নয়। সৎপথে তিনি উপার্জন করেন, হোক না ড্রাইভার—সে জন্যে আমি তাঁকে ঘৃণা করব? কিন্তু অসৎ পথে তিনি তাঁর জীবন কাটান। থাকেন শহরে, আমাদের পল্লীতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। আমার মায়ের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও তিনি রাত কাটিয়েছেন বহুবার। এ খবর আমি প্রসাদদার কাছ থেকে পেয়েছিলুম। তোমার দাদা চরিত্রহীন। এই জন্যেই আমি তাঁকে বিয়ে করতে চাইনি। আমার স্বামী হবে শিবঠাকুর। যাকে নিয়ে আমি ঘর করব সে আমায় ছাড়া আর কিছু চাইবে না। আমরা দুজনে দুজনের জন্যে। কিন্তু তোমার দাদা সে প্রকৃতির লোক নয়। যেদিন আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব তিনি পাড়লেন, সেই

রাত্রেও তিনি মাতঙ্গিনীর ঘরে রাত্রিবাস করেছেন। মাতঙ্গিনী আমায় নিজে বলেছে। সে আমার মার ভাড়াটিয়া। তোমার দাদা গর্ব করে তাকে বলেছিল, 'জানিস আমায় খুব খাতির করবি, আমি তোদের সব্বার মনিব হতে যাচ্ছি। আমি তোদের বাড়িউলির জামাই হব, তার মেয়ে ঝুনুকে বিয়ে করব, শাশুড়ীর কাছ থেকে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে পাব। তারপর তোদের মনিব হব।' মাতঙ্গিনী এসব কথা আমার কাছে লাগিয়ে গেল। তোমার দাদার ওপর আমার মন বিষিয়ে গেল। আমি মাকে বললুম, কিছুতেই নয়, ঐ ড্রাইভারকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না। তোমার পছন্দ হয় তুমি ওকে ড্রাইভার রাখ, কিন্তু আমি তাকে জামাই হতে দেব না। মাও খুব গালিগালাজ করল, মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়ি, চোখখাগি, আরও কত কি বলল। কিন্তু আমি গোঁ ধরে রইলুম। শেষে মা বাবার সঙ্গে পরামর্শ করল। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হল। তোমার দাদাই করলেন সম্বন্ধ। মা বললেন, 'হতচ্ছাড়ির উঁচু নজর। ড্রাইভারকে বিয়ে করবে না, কিন্তু চাষাকে পছন্দ করবে?' শোন মার কথা। মা নিজে চাষার মেয়ে। দাদু ছিলেন চাষা। মেদিনীপুরে তাঁর অনেক জমিজমা ছিল। নিজের হাতে হাল দিতেন। আমি ছেলেবেলায় তাঁর কোলে চড়ে বলদের ল্যাজ মলেছি। তুমি চাষআবাদ কর শুনে পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। প্রসাদদাকে দিয়ে তোমার খবর আনালুম। প্রসাদদা আমার পাড়ার দাদা। ছবি বাড়িউলির ছেলে। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করে। আমায় বোনের মত ভালোবাসে। ভাইফোঁটার দিনে আমি তাকে ফোঁটা দিই। সে আমায় সব সময় চোখে চোখে রাখে। কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে সে তেড়ে যায়। সেই প্রসাদদাকে বললুম তোমার খবর আনতে। বাড়ির কেউ জানল না। প্রসাদদাকে পয়সা দিলুম। প্রসাদদা চুপি-চুপি তোমাদের গাঁয়ে গেল। ফিরে এসে বলল, 'ওরে ঝুনু, তোর বর একেবারে শিবঠাকুর, বোম্ ভোলানাথ।' আমিও তো তাই চাই। আমাদের পাড়ার শিবমন্দিরে আমিও তো ছোটবেলা থেকে ফুলবেলপাতা চড়িয়েছি। শিবরাত্তিরের উপোষ করেছি, শিবের মত বর চেয়েছি। তবে আমার উমার তপস্যা সার্থক হল। আমি মাকে বললুম 'ঐখানে বিয়ে করতে রাজী।' মা বললে, 'সে কি রে? তুই একটা গেঁয়ো চাষার ঘর করবি। তোর ভারী কষ্ট হবে। আমি তা হতে দেব না, আমি ছেলেটাকে ঘরজামাই করে রাখব।' আমি রেগে বললুম, 'কক্ষনো না। তোমার জামাই ঘরজামাই হতে

যাবে কেন? তার কি চালচুলো নেই? তার জমিজমা আছে, গরুবাছুর আছে,—আমি তার ঘর করতে পারব।' মা বিরক্ত হয়ে বলল, 'মেয়ের ঢং দেখে আর বাঁচিনে। শহুরে মেয়ে, কল টিপলেই জল, সুইচ টিপলেই আলো, নাচগান, সিনেমা থিয়েটার, গতরসুখ। এসব ছেড়ে কিনা মেয়ে গাঁয়ে বাস করবে? পুকুরে চান, ভিজে কাপড় নেপটে বাড়িফেরা, জলের ঘড়া বয়ে নিয়ে আসা, গোবর লেপা, গাইয়ের জাবনা দেওয়া, থুঃ—!' আমি থাকতে পারলুম না, বললুম, 'তোমার বাবা, আমার দাদুও তো চাষা ছিল।' মা কপট রাগ করে বললে, 'মর আবাগীর বেটী, তোর সাহস তো কম নয়। তুই বিন্দি বাড়িউলির মুখের ওপর বাপ তুলে কথা কস? অন্য কেউ হলে তার মুখে নুড়ো জেলে দিতুম।' বলতে বলতে মা'র চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল। আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওসব পুরানো কথা আর তুলিসনে মা। ওসব চুকেবুকে গেছে। ঐ জায়গায় বিয়ে করে তুই যদি সুখী হোস তো আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমি মরলে এসব ঘরবাড়ি কে দেখাশুনো করবে?' আমি বললুম, 'তুমি যাকে খুশী ওসব বিলিয়ে দিয়ো মা, ওসব আমি চাই না। পাপের অন্ন অনেক খেয়েছি, এবার একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।' মা রাগ করল না। শুধু বলল, 'ওরে আমার কে রে? পাপপুণ্যি বিচার করবার ক্ষমতা কে দিয়েছে তোকে? উর্বশী, মেনকা, রম্ভার সঙ্গে দেবতাদের রাজা ইন্দির বিহার করত না? দেবতা হলে লীলাখেলা আর পাপ হবে মানুষের বেলা? লোকে গতর খাটিয়ে রোজগার করে, আমরাও গতর খাটিয়ে রোজগার করছি। এতে পাপপুণ্যের কি আছে? এই যে কত ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে, গরীব দুঃখী অভাগী দুটো পয়সা দিয়ে অন্তত কিছুক্ষণের তরে শরীর সুখ কিনে নেয়, এতে কার ক্ষেতি? মানুসে মদ, গাঁজা, ভাঙ খাচ্ছে, চুরি ডাকাতি রাহাজানি খুনখারাপি করছে, ভেজাল মিশিয়ে লোক মারছে, আমরা কি তাদের চেয়েও খারাপ কাজ করছি?' আমি থাকতে পারলুম না, বললুম, 'তুমি যতই বল মা, এ পাপ, পাপ, পাপ। দেহ বিক্রী করে মেয়েছেলে রোজগার করবে, এর চেয়ে পাপ আর কি আছে, মা?' মা বলল, 'তুই হাসালি মা। কত লোকই তো দেহ বিক্রী করছে, রিকৃশাওয়ালা রিকৃশা টানছে, ড্রাইভার বাস-মোটর চালাচ্ছে, চাষা ক্ষেতে খেটে মরছে, এ সবই তো এক ধরনের দেহবিক্রী। তারা কেউ পাপ করে না, আর আমরা করলেই পাপীয়সী?' আমি জোর করে বললুম, 'তবু এ পাপ; পাপ, পাপ। আমি এই পাপের

'আবহাওয়া থেকে মুক্তি চাই।' তাই তো আমি বিয়ে করে ঘর বাঁধবার জন্যে ব্যাকুল হলুম। তোমার ঘরে গিয়ে আমি যেন হাঁফ ছাড়লুম। আমার মনে হল তোমার তালপুকুরে চান করে যেন আমার সব পাপ ধুয়ে গেল। তোমার চালাঘরের বাতাস যেন মনের ভেতরের সব দুর্গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে গেল।......'

বেশ লম্বা লম্বা চিঠি। খুব গুছিয়ে লিখতে পারে মালতী। কত খুঁটিনাটি বিষয়, কত মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় সম্ভাষণ! চিঠির মধ্যে মালতী তার স্বামীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। সে তো ভাবেনি যে এই চিঠি অন্যের কাছে পড়বে, কিংবা প্রকাশ্য আদালতে অসংখ্য লোকের সামনে তা উচ্চৈঃস্বরে পড়া হবে লুব্ধ কর্ণতৃপ্তির জন্যে। কিন্তু দত্তগুপ্ত ঠিক বলেছে, এসব চিঠি আদালতে দাখিল করলে সহদেবের মামলা ভেস্তে যাবে। জজসাহেব তার ফ্রডের গল্প বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করবেন না। অবশ্য বাদিনীর পক্ষ থেকে এই চিঠি পেশ করার জন্যে দাবী তোলা যায়। কিন্তু সহদেব অস্বীকার করলে সব ল্যাটা চোকে। কপি রেখে তো কেউ আর স্বামীকে প্রেমপত্র লেখে না।

সহদেব নিশ্চয়ই তার চিঠির কোন নকল রাখেনি। তাই সে কি লিখেছিল তা জানবার উপায় আমার ছিল না। তবে মালতীর চিঠি থেকে সহদেবের দু'একটা বক্তব্য জানা যায়। সহদেব নিজেও বেশীদূর পড়েনি। গাঁয়ের স্কুলে ক্লাস সেভেন, এইট অবধি পড়ে সে ক্ষেতখামারের কাজে লাগে। তার দাদা গাঁয়ে পড়ে থাকতে চায়নি, শহরে চলে আসে, একটা মোটর ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করে লাইসেন্স পায়, এখানে সেখানে কাজ করে হাত পাকালে পর সঞ্জিত দত্তগুপ্ত সাহেবের কাজে বহাল হয়েছে। কিন্তু সহদেব গাঁয়েই থেকে যায়। নিজের হাতে চাষ আবাদ করে এ বাজারে বেশ লাভও করতে থাকে। তার অবস্থাও সচ্ছল, মোটা ভাত কাপড়ের অভাব নেই। বাগানের তরিতরকারী পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ধান তাকে সম্পন্নের পর্যায়ে ফেলে। সে গ্রাম্য রাজনীতিতে অংশ নেয়, নির্বাচনে মাতব্বরি করে, অঞ্চল পঞ্চায়েতে সাফল্যের সঙ্গে নির্বাচিত হয়, কৃষিমেলা বসায়, যাত্রাগানের ব্যবস্থা করে, ভ্রাম্যমাণ সিনেমাও নিয়ে যায়, পুতুলনাচের আয়োজন করে। এককথায় সহদেব গ্রামাঞ্চলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংস্কৃতিবান কৃষিজীবী।

সেই সহদেব যখন কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেল, গ্রামে বেশ আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। সকলেই বেশ খুশী। পল্লীবধূরা ভিড় করে দেখতে এসেছিল নতুন বউকে। শহুরে মেয়ের কোন চাল নেই, দেমাক নেই,

সুশ্রী ভদ্র তার চেহারা, মিষ্টি তার হাসি। আরও মিষ্টি তার গানের গলা। পাড়ার মাসিপিসী, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ধন্যি ধন্যি করেছিল সহদেব আর নতুন বউএর। সহদেবও খুব খুশি।

তারপর কেমন করে জানি না আসল ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল মালতীর জীবনে।

মালতী আর একটা চিঠি লিখেছিল, '… …তুমি লিখেছ প্রজারঞ্জনের জন্যে রামচন্দ্র নিষ্পাপ জেনেও সীতাদেবীকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু, আমি বলি, এটা ত্রেতাযুগও নয়, তুমি রামচন্দ্রও নও, আমিও সীতা নই। কি অপরাধে তুমি আমায় ত্যাগ করবে? একবার সন্ধ্যাতারা ক্লাবে 'মৃচ্ছকটিক' অভিনয় হয়েছিল। সংস্কৃত নয়, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের অনুবাদ। কেটেকুটে ছোট করা হল। আমি সেজেছিলুম বসন্তসেনা। সেই গণিকা দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রেমে পড়েছিল। রাজশ্যালকের প্রলোভন, ভীতিপ্রদর্শন উপেক্ষা করেও সে চারুদত্তের প্রতি অনুরক্ত ছিল। বধ্যভূমি থেকে প্রেমিকের উদ্ধার ঘটিয়ে সে চারুদত্তকে বিয়ে করে। গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করে সে ব্রাহ্মণের ঘরণী হয়। রাজাও তা অনুমোদন করে। তুমি বোধ হয় নাটকটা পড়নি। পড়লে নিশ্চয়ই তোমার খুব ভালো লাগত। আমার লেগেছিল। অভিনয়ের সময় আমি নিজেকে বসন্তসেনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলুম। অভিনয় তো করিনি, যেন আমার মনের গোপন কথা লোকসমক্ষে প্রকাশ করে ফেলেছিলুম। অনেক প্রশংসা পেলুম, অনেক হাততালি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সেকালে ব্রাহ্মণ চারুদত্ত গণিকাকে ঘরণী করলে নিন্দাভাজন হননি। কিন্তু একালে গণিকার কন্যা ঘর বর পাবে না? সামাজিক নিন্দা, লোকলজ্জা, কুৎসা, ঘৃণা, অত্যাচার? আমি তো বেশ্যা নই, হতে পারে আমার মা বেশ্যা ছিলেন, এখনও বেশ্যাদের চালিয়ে রোজগার করেন, আমি সেই অন্নে প্রতিপালিত। কিন্তু সমাজে বেশ্যার অন্ন খেয়েও কত বড় বড় লোক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সে খবর আমি রাখি। অবশ্য এ ব্যাপার তারা গোপনে সারতে চায়, যদি কলঙ্ক থাকেও তো খোলস এঁটে সে কলঙ্ক তারা ঢেকে রাখতে চায়। সেই সব বড় বড় লোকের নাম আমি ফাঁস করে দিই, তো অনেকেরই উঁচু মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কিন্তু বেশ্যা মহলেও একটা নীতিবোধ আছে। খরিদ্দার বাবুদের তারা বিপদে ফেলতে চায় না। চোরেদের মধ্যেও একটা ধর্ম থাকে। কিন্তু যারা বাইরে ভদ্রতার খোলস এঁটে ভেতরে কদাচার করে, তারা কি আরও বড় অপরাধী

নয়? তা'হলেই কি ভগুামী করে পার পেয়ে যাবে? আমি গণিকা নই, বিশ্বাস কর আমার চরিত্র নিষ্কলুষ, আমি ভদ্রভাবে জীবন কাটিয়েছি, কিন্তু লোক-নিন্দার ভয়ে তুমি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি বলেছ, তুমি আমায় ভালোবাস। আমিও তোমায় ভালোবাসি। বিয়ের পরেই এই ভালোবাসা। তবু আমাদের ধর্মবিবাহ বিবাহ বিফল হয়ে যাবে? ভালোবাসাহীন যে বিয়ে, ভয়ে, লোভে, কামনায় যে মিলন, সেই তো প্রকৃত বেশ্যাবৃত্তি।......'

নকুল-সহদেব একদিন আমাকে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। নকুল গ্রামে জমিজমা বেচে দিয়ে শহরেই বাস করত। সহদেব পৈতৃক জমি শুধু রাখেনি আরও বাড়িয়েছে। দেশে তাদের আত্মীয়-স্বজনও আছে। আমাকে নিয়ে যাবার উপলক্ষ্য হল গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ। সহদেব সেই স্কুলের সম্পাদক। সহদেবের ইচ্ছা স্কুলটা দশম শ্রেণী পর্যন্ত হোক আর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাক। আমি গেলে নাকি গ্রামবাসীদের উৎসাহ বাড়বে। চাঁদা সংগ্রহ সহজ হবে। দুটো ঘর অর্ধেক তৈরী হয়ে পড়ে আছে। তাদের ছাদ তোলা যাবে। সেখানে দুটো ক্লাসরুম হতে পারে। আমার সুপারিশে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। জায়গাটা কলকাতা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল। ওদের অনুরোধে রাজী হয়ে গেলুম। ওরা আমন্ত্রণ পত্র ছাপাল। তাতে আমার নাম মোটা অক্ষরে ছাপা হল।

নকুল সেদিন সঞ্জিত দত্তগুপ্তের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমার মোটরকারটা চালাল। কারটা পুরানো। নকুল বেশ র‍্যাশ্ ড্রাইভ করে। মাঝে মাঝে ওকে আমি সংযত হতে বলেছিলুম। ঠাকুরপুকুর অবধি ভীড়। তারপর বেশ ফাঁকা। ডায়মণ্ড হারবার রোড দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছতে আমাদের একঘণ্টার কিছু বেশী লাগল। নকুল আমাকে নিয়ে সকালেই বেরিয়েছিল। সহদেব আসেনি। ফাংশানের আয়োজন করতে ব্যস্ত। কথা ছিল আমি সকালেই যাব। ওদের বাড়ীতে খাব। দুপুরে বিশ্রাম করে বিকালে সভা সেরে সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ী ফিরব। একদিনের আউটিং মন্দ নয়।

গ্রামটি বাসরুটের ওপর। বেশ বড়সড়। এখনও ইলেকট্রিক আসেনি। তবে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। অনেকে বাসে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। কৃষকেরা তরি-তরকারী নিয়ে যায়, জেলেরা মাছ নিয়ে বেহালার বাজারে বেচে আসে। পরিবেশটা ভাল।

সেদিন ছিল হাটবার। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। সকাল থেকেই জনসমাগম মন্দ নয়। পথের ধারেই ছোট্ট বাজার, তার পাশে খোলা জায়গায় হাট বসে।

নকুল-সহদেবের বাড়ী পর্যন্ত গাড়ী যায় না। তাই হাটের কাছে একটা খোলা জায়গায় গাড়ি রেখে কাচ তুলে চাবি বন্ধ করে নকুল চায়ের দোকানের মালিকের জিম্মায় সেটা দিল। তারপর দুজনে হেঁটে সরুপথ দিয়ে ওদের বাড়ীতে গেলুম। কিছু কৌতূহলী বালক বালিকাও আমাদের পিছু নিল।

গাছপালায় ঢাকা একটা উঠানের চারিপাশে ওদের ঘরগুলি। গোটা দুয়েক পাকা ঘর, টালির ছাদ, বাকি সব কাঁচা। গোয়ালে দু'তিনটে গরু আর বাছুর। রং-বেরংয়ের দেশী মুরগী চরে বেড়াচ্ছিল। বড় পুকুরে গোটা কয়েক হাঁস। দুটো ধানের গোলাও চোখে পড়ল। কলকাতার এত কাছে এ রকম গ্রাম্য পরিবেশ খুব ভাল লাগছিল।

সহদেব এগিয়ে অভ্যর্থনা করল। কিভাবে সে আপ্যায়ন করবে যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। সে নিজেই ডাব কেটে মিষ্টি জল খাওয়াল। উঠানে একটা দাওয়ার উপর তক্তায় সুন্দর একটা সতরঞ্চ পাতা ছিল। তাতে গোটা দুই তাকিয়া। সেখানেই আমি বসলুম।

আমি স্নান করব কিনা সহদেব জিজ্ঞাসা করল। সে গর্বভরে বলল, 'পুকুরে নাইতে হবে না, স্যার। একটা পাকা স্নান ঘর আর সেনিটারি পায়খানা নতুন তৈরী করিয়েছিলুম। টিউবওয়েলের জল। স্নান করলে অসুখের ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'স্নান সেরেই এসেছি।' মনে ভাবলুম হয়ত শহুরে বৌ-এর সুবিধার জন্যেই এই কল-পায়খানা। কিন্তু ঘরণীহীন এই ঘর ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। আশে-পাশে দু'একজন গ্রাম্য রমণী চোখে পড়ল বটে, তারা সম্ভবতঃ রন্ধনশালায় ব্যস্ত। নকুল আমায় সহদেবের হাতে তুলে দিয়েই সরে পড়েছিল। সহদেব একাই আমার আপ্যায়নে ব্যস্ত রইল। আমি বললুম, 'সহদেব' আমার জন্তে তুমি আটকে থেক না। আমি ভালোই আছি। তোমার যদি অন্ত কাজ থাকে, যাও।'

'তাই যাব, স্যার,' সহদেব বলল, 'বাড়িটা ফাঁকা। দাদাও ওদিকে

কোথাও গেছে। আমার কিছু কাজ বাকী আছে ফাংশানের ব্যাপারে। এখানে একা থাকতে আপনার ভালো লাগবে তো?'

'তুমি আমার জন্যে ভেব না।'

'কিছু যদি মনে না করেন, স্যার, তো বলি,' সহদেব বলল, 'আমার এক আলমারি বাংলা বই আছে। যদি দু'চারটে বই উল্টেপাল্টে দেখেন তো ভাল হয়।'

'কোথায় বই?'

'আপনার কাছে এসব কিছু নয়, তবু—'

সহদেব উঠোন পেরিয়ে একটা পাকা ঘরে আমায় নিয়ে গেল। সেটি তার শোবার ঘর। আধুনিক নতুন আসবাবপত্র। সুন্দর জোড়া খাট, তার উপরে সুদৃশ্য বেডকভার, ড্রেসিং টেবিল—তাতে আধুনিক প্রসাধন দ্রব্য সাজান, ষ্টিলের আলমারি আয়না দেওয়া, আলনা, এক আলমারি বই, জানালায় রংবাহার পর্দা। সিলিং দেওয়া টালির ছাদ ঘরটার। কিন্তু শৌখিন আসবাবপত্রে সেটি যেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছিল, যা গ্রামে অপ্রত্যাশিত।

সহদেব সলজ্জভাবে বলল, 'এসব বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলুম। ভাবছি এগুলি সব ফেরত দিয়ে দেব। মামলার ফলাফলটা দেখি কি হয়।'

আমি মৃদু হেসে বললুম, 'ফেরত দেবে কেন? বরং তোমার স্ত্রীকে ফেরত নিয়ে এস। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে আসুক।'

জজ সাহেব কি রায় দেবেন জানি না। কিন্তু আমি মালতীর চিঠি পড়ে আগে ভাগেই তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলুম। মনে ভাবলুম এই রায়ই আমার মক্কেলের মঙ্গল করবে।

সহদেব বলল, 'আমি তো তাই ভাবছি, স্যার। কিন্তু—'

'আচ্ছা, ওসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে।' আমি বললুম, 'তুমি এখন কাজে যাও। আমি এই আলমারির বই ঘাঁটি।'

আলমারির চাবি খুলে দিয়ে সহদেব চলে গেল। ঘরে আমি একা। বই দেখা বন্ধ রেখে ছবি দেখতে লাগলুম।

শোবার ঘরটি মালতী-ময়। দেওয়ালে তার ছবি। ড্রেসিং টেবিলে তার ছবি। নানা পোজের। মালতীর ছবি আগে কখনও দেখিনি। আগ্রহের সঙ্গে দেখলুম। সে সুন্দরী নয় কিন্তু চেহারায় একটা আলগা চটক আছে। ছবিতে তার ঠোঁট দুটি বেশ পুরু লাগছে, নাকটাও মোটা, কিন্তু চোখদুটি

উজ্জ্বল, প্রাণময়। দু একটা গ্রুপ ফটোও টাঙান আছে, মনে হল তা শৌখিন থিয়েটারে দলের সঙ্গে। মেক্ আপ নিলেও মালতীকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না। ড্রেসিং টেবিলে মালতীর একক ছবি ছাড়াও বরবধূর একখানি ফটো চোখে পড়ল। তাতে সহদেবকে মানিয়েছিল ভারী সুন্দর। সে কালো হলে কি হবে, তার মুখটি অতি সুন্দর।

সময় অনেক রয়েছে হাতে। আমি ধীরে সুস্থে বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখলুম। নানা ধরনের বই। কতকগুলি বিবাহের উপহার হিসেবে পাওয়া। কয়েকটা ঝুনু দাসীর নাম লেখা। কয়েকটা নাটকের বই, মালতী মিত্রের নাম তাতে গোটা গোটা করে চোখ পড়ল। বইগুলি ব্যবহারে কিছুটা মলিন হয়ে গেছে; তার ভিতরে খানিকটা কাটাকুটিও আছে। আরে আমার 'শহরতলী' নাটকের এক কপিও আছে। বুঝলুম ওগুলি মালতীর ব্যবহারের জন্য রিহার্সাল কপি। সে যত্ন করে ওগুলি রেখেছিল। বিয়ের পর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু চলে যাবার সময় সে এগুলি নিয়ে যায়নি। এগুলি যেন প্রমাণ করছে, সে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসতে চায়।

বইগুলি নাড়তে চাড়তেই সময় কেটে গেল। দুপুরে আহারের প্রচুর আয়োজন। একপেট খেয়ে দিবানিদ্রার আমেজ এসে গেল। সহদেব তার শোবার ঘরেই আমার বিশ্রামের আয়োজন করেছিল। একেবারে পাট ভাঙা ধোপ দুরস্ত বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

আমার কিন্তু ভারী অদ্ভুত লাগছিল। মালতী-সহদেবের বিয়ের খাট এটা। বেশ নরম গদি। এই শয্যায় শুয়ে নবদম্পতী প্রণয়গুঞ্জন তুলেছে, আদরে আদরে পরস্পরকে ভরিয়ে তুলেছে—। এই সব এলোপাথাড়ি ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তার ঠিক নেই। হঠাৎ একটা কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে পড়লুম। ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করলুম। কারা উচ্চৈঃস্বরে বচসা করছে। অনেকগুলি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলুম। নকুল-সহদেবের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরের টুকরো কানে এল। অন্যদের গলাও শোনা গেল। ব্যাপারখানা কি ?

ঘরের বাইরে এসে দেখি সহদেব একটা লাঠি নিয়ে তড়পাচ্ছে। নকুল তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। দূরে যুযুধান অপর পক্ষ।

সহদেব চিৎকার করছিল, 'আজ আমি খুন করব। মেরে মাথা ফাটিয়ে

ফাঁসি যাব। এরা পেয়েছে কি? বাইরের মানী অতিথি এসেছেন। তাঁর একটা সম্মান নেই?'

কে একজন প্রতিপক্ষ বলল, 'মানীর মান রাখার জন্তেই তো আমাদের দাবী।'

পিছন থেকে একদল শিশু সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'খানকির জামাই গদি ছোড়ো, আভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো।'

সহদেব লাঠি হাতে আবার তেড়ে যেতে গেল, চিৎকার করল, 'শূয়োরের বাচ্চাদের মেরে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, তবে আমার নাম সহদেব দাস।'

নকুল তাকে ধরে রাখতে পারছিল না।

শিশুরা প্রতিপক্ষের আস্কারা পেয়ে আবার স্লোগান তুলল। অদ্ভুত অশ্লীল লাগছিল এই স্লোগান।

আমি আর থাকতে পারলুম না, ডাকলুম, 'নকুল—সহদেব—।'

আমার কণ্ঠস্বরে সবাই যেন চমকে উঠলো। সহদেব লাঠি নামিয়ে গজগজ করতে করতে কাছে এল। নকুল পিছনে পিছনে। প্রতিপক্ষের দল সেখান থেকে হঠাৎ সরে পড়ল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'ব্যাপার কি নকুল? ব্যাপার কি সহদেব?'

সহদেব মুখ বুজে মাথা হেঁট করে রইল।

নকুল বললে, 'গ্রাম্য দলাদলি, স্যার। জানেন তো সব জায়গায় দল আছে। আমাদের গ্রামেও তাই। আমাদের বিরুদ্ধ দল আজকের ফাংশানকে পণ্ড করতে চায়। অনেক দিন থেকে তারা স্কুলটাকে দখল করতে চাইছিল। কিন্তু গার্জেনদের ভোটে পারেনি। এবার তারা সুযোগ পেয়েছে। বিয়েটাকে কেন্দ্র করে তারা গ্রামে ঘোঁট পাকিয়ে তুলছে। বেশ কিছু সাপোর্ট পাচ্ছে। ছেলের দলকেও ক্ষেপিয়েছে। শুনলেন তো স্লোগান।'

'কি চায় তারা?' আমি জানতে চাইলুম।

'তারা চায় সহদেব এখনই আপনার সামনে স্কুলের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করুক।' নকুল বলল। 'ঐরকম একটা নোংরা বিয়ে যে করেছে সে স্কুল চালাবার উপযুক্ত নয়। ওখানে কো-এডুকেশন। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। একটা খারাপ আদর্শে ওরা বকে যাবে।'

'আমি বলছি স্যার, ছেড়ে দেব সেক্রেটারী পদ।' সহদেব রাগতভাবে বলল, 'কি আছে ওতে? আমি তো মাষ্টারের মাইনে মেরে রোজগার করি

না, আমার কি লাভ ওতে? কিন্তু ওরা শুনবে না, বলে এখনি পদত্যাগ পত্র লিখে দাও, নইলে ফাংশন হবে না।'

নকুল বলল, 'তাও ওদের বোঝাতে গেলুম যে সহদেব ওই বৌকে ত্যাগ করেছে। আদালতে মামলা চলছে, সাহেবরা আমাদের হয়ে লড়ছেন। তবু ওরা বিশ্বাস করে না। বলে লুকিয়ে বর-বউয়ের মধ্যে চিঠিচাপাটি চলেছে, কলকাতায় ওরা ঘরকন্না করছে—এই সব আবোলতাবোল কথা।'

'না হোক ফাংশন,' আমি ঈষৎ রেগে বললুম, 'আমার জন্যে ভেব না, খেলুমদেলুম বেড়িয়ে গেলুম। এ যুগেও পল্লী সমাজের নীচতা নিজের চোখে দেখে গেলুম। আমার খাতিরে, তুমি যেন পদত্যাগ কর না। মামলা লড়তে হয়, আমি আছি।'

সহদেব ঈষৎ আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'সে জন্যে ভয় করি না, স্যার, দরকার হলে মামলাও লড়ব, লাঠিও ধরব। চাষার পো আমার অত মানসম্ভ্রমের বালাই নেই। কিন্তু ওরা ঘোঁট পাকিয়ে স্কুলটার দফা নিকেশ করবে। তাই ভাবছি।'

'আমি বলি কি,' নকুল বিজ্ঞের মত পরামর্শ দিল, 'তুই রেজিক্‌নেশন দে, দে, ফাংশনে যাস নিক। স্যার এসেছেন, প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন হয়ে যাক্। তারপর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে লড়া যাবে।'

সহদেব বলল, 'না তা আমি পারব না। ওরা পেয়ে বসবে। শুধু স্কুল না, অঞ্চল পঞ্চায়েতের ব্যাপারেও আমার পিছনে লাগবে, শেষ পর্যন্ত ভিটেমাটি ছাড়া করবে। আমি লড়ব।'

'বহুত অচ্ছা, সহদেব,' আমি বললুম, 'তোমাদের ফাংশনের কত দেরি? চল আমরা যাই।'

'তাই চলুন, স্যার', সহদেব বলল, 'আপনার জন্যেই ভাবছিলুম। আপনি যখন কিছু মনে করেননি তখন কুছ পরোয়া নেই। আমার দলবল তো তৈরীই আছে।'

আমরা দেরি না করে স্কুলের দিকে এগিয়ে গেলুম। ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে পথ। দূরে স্কুলের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। একটা বড় পাকা ঘর। টিনের ছাদ। বাকিগুলি কাঁচা ঘর খড়ের ছাউনি। একটা জাতীয় পতাকা উড়ছে পাকা ঘরের মাথায়। চট দিয়ে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, কাগজের নিশান সারি সারি টাঙানো আছে। কিছু যুবক লাঠি হাতে ঘুরছে। সহদেব বলল, 'ওরা আমাদের লোক।'

পথে বাঁশপাতা আর ফুল দিয়ে গোটা দুয়েক গেট করা হয়েছিল আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে। তার একটা ঘাড় মটকে পড়ে গেছল। সহদেব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'বদমাইশের দল এই গেটটা ভেঙে দিয়েছে।'

বলা বাহুল্য এই উত্তেজনার মধ্যে পুরস্কার বিতরণী সভা মোটেই জমল না। হাঙ্গামা আশঙ্কা করে খুব কম লোকই এসেছিল। শিক্ষকদের না এলেই নয়, তাই তারা হাজির ছিল। একটি মেয়ের উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার কথা। শুনলুম মালতীর কাছে সে গান শিখত। কিন্তু সে গরহাজির।

সহদেব বলল, 'মেয়েটি খুব অনুগত, নিশ্চয়ই তাকে আসতে দেওয়া হয়নি।' একজন শিক্ষক ধরা গলায় বেসুরো রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে সভার উদ্বোধন করলেন। দূর থেকে বহু কণ্ঠের সেই নোংরা স্লোগান প্রায়ই শোনা যেতে লাগল। বহু কৃতি ছাত্রছাত্রী প্রাইজ নিতে আসেনি। মাইকে তাদের নাম বারবার ডাকা সত্ত্বেও তারা হাজির হল না। মধ্যে থেকে দু চারটা ইট ধুপধাপ করে চটের সামিয়ানার ওপর এসে পড়ল। একটা ইটের টুকরো বুঝি স্বেচ্ছাসেবকের কপালে লাগল। আঘাত অল্প, তবে রক্ত ঝরতে লাগল। ফার্স্ট এড বক্স স্কুলেই ছিল। এক শিক্ষক তাড়াতাড়ি তার চিকিৎসা করলেন। এই নিয়ে খানিক গোলমাল হল সভার কাজে। সহদেবের দল লাঠি হাতে ছুটলো হামলাকারীদের তাড়িয়ে দিতে। আমি দু চার মিনিট কিছু বলে সভাপতির ভাষণ শেষ করলুম। ওরা চায়ের ব্যবস্থা করছিল। আমি বারণ করায় ওরা বিরত হল।

এবার ফেরার পালা। সহদেবের সঙ্গীরা লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে আমায় গাড়িতে তুলে দিল। সহদেব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইল, বলল, 'আপনার অনেক কষ্ট হল। ওরা যে এতটা ছোটলোকমি করবে তা আমি বুঝতে পারিনি, তাহলে আরও পাহারার ব্যবস্থা রাখতুম।'

আমি বললুম, 'এজন্য তুমি ভেব না, সহদেব। তোমার দোষ কি? তুমি তো যথাসাধ্য করেছ। এখন বুঝলুম তুমি কোথায় আছ? কেন তুমি মালতীকে ঘরে ফেরাতে পারছ না।'

সহদেবের দল উৎসাহের সঙ্গে আমার জিন্দাবাদ দিতে লাগল। দূর থেকে সেই নোংরা স্লোগান আবার ভাসা ভাসা শোনা গেল।

নকুল আমার মোটরে ষ্টার্ট দিল। আমি হাত নেড়ে ওদের কাছে বিদায় নিলুম। গাড়ীটা রাস্তায় পড়তে দুম্ করে একটা ইটের টুকরো বডির ওপর এসে পড়ল। অল্পের জন্যে কাচটা বেঁচে গেল। নকুল দাঁত চেপে একটা

অকথ্য গালিগালাজ করল অজ্ঞাত আততায়ীদের উদ্দেশ্যে। সে একসিলেটারে চাপ দিল। গাড়ি ছুটে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মালতী একটা চিঠিতে লিখেছিল '........আমি তো তোমার গাঁয়ের লোকের কোনও ক্ষতি করিনি বরং তাদের উপকার করেছি। মেয়েরা আমার কাছে গান শিখতে এসেছে, ছেলেরা শিখেছে আবৃত্তি। ছোটদের নিয়ে আমি সিরাজ-উদ্দৌল্লা নাটক নামিয়েছি। রিহার্সাল দেওয়ান, পার্ট বলান, সাজগোজ করান ষ্টেজ বাঁধান কিছুই তো আমি বাদ দিইনি। তোমার স্কুলের উঠোন সেদিন লোকে লোকারণ্য। কত লোক এসে আমায় প্রশংসা করে গেছে। স্ত্রী ভাগ্যের জন্য তোমায় সাধুবাদ দিয়েছে। কতদিন দুপুরে মেয়েরা এসেছে আমার কাছে সেলাইফোঁড়াই শিখতে। আমার সাজসরঞ্জাম নিয়ে তারা নতুন নতুন জিনিস শিখেছে, আমার সেলাইয়ের কলে সেলাই করেছে, রেডিওর মহিলামহল থেকে পত্রিকার বৌঠাকুরানীর হাট থেকে আমি নতুন নতুন রান্না নিয়ে পরীক্ষা করেছি, সেই রান্না খেয়ে তোমরা তারিফ করেছ, সেই রান্না আমি কত মেয়েকে শিখিয়েছি। আর শিখিয়েছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, স্বাস্থ্যের সাধারণ বিধান। আর কি এমন ঘটল যাতে রাতারাতি আমি ঘৃণ্য, নোংরা, অস্পৃশ্য অশুচি হয়ে গেলুম, যে জন্যে আমার স্বামীর ঘরে আমার ঠাঁই হল না? আর সব পুরুষই শুচি? তোমার দাদা—আমার ভাসুর ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি শহরে কোথায় কোথায় রাত্রিবাস করেন, সে নিয়ে তো গ্রামে কেউ আপত্তি তোলে না। বাঁড়ুজ্জে মশাই, যিনি তোমাদের আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি—বঁড়শে-বেহালায় একটা অন্য জাতের মেয়েকে বাঁধা রেখেছেন, সে জন্যে তো কারুর কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় না। তবু ওদের সকলের যত আক্রোশ, নিন্দা, ঘৃণা শুধু আমার ওপর।.......'

নতুন নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়েছিল। বেণীদার বিশেষ অনুরোধে অনেকদিন বাদে ক্লাবে গেলুম। রিহার্সালের জন্যে কেউ কেউ জমায়েত হয়েছিল। নতুন এক অভিনেত্রী এসেছে। তার মুখটা পাউডারের প্রলেপে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখে কাজল, ঠোঁটে উগ্র লিপষ্টিকের রং,পাতলা শাড়ীটা কাঁধ থেকে হড়কে পড়েছে, দেখা যাচ্ছে তুঙ্গ স্তনের গড়ন, লোকাট্ ব্লাউজের উপরে বুকের খাঁজটা অতি স্পষ্ট, সরু কাঁচুলির নীচে পেটের মেদস্তর। লাস্য-ময়ী এই নারীকে ঘিরে কয়েকজন সভ্য টুকরো রসিকতায় মগ্ন। তাদের মধ্যে কেশব দত্তও ছিল। সে নতুন অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

বিনিময়ে মৃদু হাসি আর একটি ছোট্ট একটি নমস্কার লাভ করলুম। কেশব বলল অনুরাধা দেবীর সঙ্গে যদি আমাদের আগে পরিচয় হত, উনি রূপসীর পার্টটা আরও ভাল করতেন। 'কালো হরিণ চোখ' ফিলমটা দেখেছ? অনুরাধা দেবী সাইড পার্টটায় যা একটিং করলেন, একেবারে ছবি! উনি এবার একাই আমাদের বইটা জমিয়ে দেবেন।'

আমি তো তার কোনও অভিনয় দেখিনি, তবে আমার মনে হল এর বেশভূষায় নিজের দেহ-প্রদর্শনীর যতটা উদগ্র ইচ্ছা, মালতী এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেশব অনুরাধাকে পেয়ে যেন নবীন উৎসাহে ডগমগ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেশব, তোমার শরীর এখন ভাল তো?'

'কেমন দেখচ?'

'ভাল।'

'খুব ভাল আছি।' কেশব ব্যঙ্গ করে বলল, 'মালতীর ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী আমায় খতম করতে পারলে না।'

'তার মানে?'

'মানে অতি সহজ,' কেশব আমাকে পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি ডিটেকটিভ্‌গিরি করলুম। বিপিন যশ লেনে আর আশেপাশে কদিন ঘোরাফেরা করে সব খবর বার করেছি।'

'কি খবর?'

'আমাকে মেরেছিল সেই পেসাদ পালের দলবল।'

'কি করে জানলে?'

'বললুম তো গোয়েন্দাগিরি,' কেশব তৃপ্তির স্বরে বলল, 'ও পাড়ার চায়ের দোকানে দু একটা মাস্তানকে চা-মামলেট খাওয়াতে পেটের খবর বার হয়ে এল। পেসাদ পাল মালতীকে খুব পেয়ার করে। শালার একটা ধোবিখানা আছে, নামটি গালভরা—দি গ্রেট ইস্টার্ন ডাইং ক্লিনিং কোম্পানী। কিন্তু আসল কাজ মাগির দালালি করা—পিম্প্‌। তাতেই মোটা রোজগার। হাতে কিছু নওজোয়ান আছে, তাদের নিয়েই ওর দাপট। দেখলে না সেদিন আমাদের ক্লাবে এসে আমাকে শাসিয়ে গেল?'

'কিন্তু সেই যে দুকার্য করেছে, তার প্রমাণ কি?'

'সে নিজে করেনি বটে, তার আস্কারা পেয়ে দলের ছেলেরা ঐ কাজ করেছে। মালতী নাকি পেসাদ পালের কাছে কেঁদে করিয়ে নালিশ করেছিল,

একটা লোচ্চা-নচ্ছার কেশব দত্ত সবার সামনে থিয়েটারের উইংসের ধারে বলাৎকার করতে গিয়েছিল। হারামজাদা দত্তর এক তরফা বিচার হল। পেসাদের বাহিনী তাকে সাজা দেবার জন্যে রড্ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

'এ সত্যি খুব অন্যায়,' আমি বললুম, 'সত্যি যদি একটা খনোখুনি কাণ্ড হত? তুমি থানায় ডায়েরী করেছ নাকি?'

'ক্ষেপেছ? এ সব নিয়ে থানাপুলিস করে কোন লাভ আছে? কে সাক্ষী দেবে? মাঝ থেকে আমারই অর্থদণ্ড। কিন্তু আমি এর একটা প্রতিশোধ নিয়েছি।'

'কি রকম?'

'যত নষ্টের মূল ঐ মাগীটা, কেশব রাগত কণ্ঠে বলল, 'তাকে ঢিট করেছি। বেটী বিয়ে করেও পার পাবে না।'

'সে কি?'

'হাঁ, তার বাপ ঐ হারু মিস্তিরের সঙ্গে দেখা করলুম। পোজ নিলুম ফিলিম প্রডিউসারের। নট-চিত্রমের ডাইরেকটর মালতী দেবীকে হিরোইন করতে চায়, একবার তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা দরকার। হারু মিস্তির টোপ গিলল। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করল। স্ত্রীটি কে জান? ময়রাপটির কুখ্যাত বিন্দি বাড়ীউলি। তিনিই ঐ মালতীর মা। আমি ভেবেছিলুম মাগীট হাফ—গেরস্ত, কিন্তু দেখি সে বাজারের বেশ্যা। ফিলিমের নাম করতেই মাগী হামলে পড়ল। তার পেট থেকে মালতীর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বার করতে একটুও দেরি হল না। উপরন্তু চা-সিঙাড়া-সন্দেশ খেয়ে এলুম।'

'তোমার মতলবটা কি ছিল?'

'প্রতিহিংসা।' কেশব দাঁত বার করে বলল, 'চলে গেলুম সেই মুরলাগ্রামে। সহদেব দাসকে খুঁজে বার করতে দেরি হল না। মিথ্যা পরিচয় দিলুম নট-চিত্রমের ডাইরেকটর বলে। মালতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলুম। লোকটা কিন্তু টোপ গিলল না। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আমাকে হাঁকিয়ে দিল।'

'বল কি? তবে তোমার প্ল্যান খাটলো না।' আমি আশ্বস্ত হলুম।

'কে বলে খাটল না? আমি তক্কে তক্কে রইলুম। মশার কামড় খেলুম। জোঁকে ধরল। আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। মাগীটাকে ধরলুম ঠিক। একটা চওড়াপাড় শাড়ী পরে সিঁথেয় সিঁদুর কপালে সিঁদুর দিয়ে সে বাড়ির ধারে টিউবওয়েল থেকে কলসী করে জল নিয়ে যাচ্ছিল। কে বলে সে বিন্দি

বাড়িউলির মেয়ে, পেসাদ পালের প্রেয়সী, দেমাকী রূপসী মালতী ঠাকরুণ? বুকভরা-মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—আমার মা বলতে ইচ্ছা করল না, করল প্রিয়তমা বলতে। কি সুন্দর মানিয়েছিল তাকে ঘরের বউএর পার্টে! মাগী আমায় দেখে চমকে উঠল, যেন চিনতেই পারল না। কিন্তু তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে বুঝতে পারলুম শালি আমায় হাড়ে হাড়ে চিনেছে।'

'তারপর?'

আমি চ্যালেঞ্জ করে বললুম, 'পেসাদ পাল আমায় খুন করতে গেছল কেন?' সে বলল, 'কে পেসাদ পাল? আপনি আমায় এ সব জিজ্ঞাসা করছেন কেন?' আমি বললুম, 'ন্যাকা? ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না? তোমার নাম করে পেসাদ পাল আমায় শাসিয়েছে। তারপর আমায় খুন করতে গিয়েছিল। তাকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।' ব্যস্, পর্দা ফাঁস। মাগী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'না, না, তাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবেন না, তার কোন দোষ নেই। আমি এসে কান্নাকাটি করেছিলুম। তার দলের ছেলেরা ক্ষেপে গিয়ে আপনাকে মারপিট করে এল। আমি তাদের হয়ে মাপ চাইছি।' এই বলে সে কলসী নামিয়ে হঠাৎ আমার পা জড়িয়ে ধরল। আমি গলে গিয়েছিলুম আর কি। কিন্তু আমার মনে অতৃপ্ত বাসনা জেগে উঠল। মনে হল ও সেই থিয়েটারের রূপসী, আমার চোখের সামনে দিয়ে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তরুণ প্রেমিকের কাছে। আমি তার কাছে আমার প্রস্তাব দিলুম। সে সাপের মত ফোঁস করে উঠল, বলল, 'আমায় কি রাজারের মেয়েছেলে পেয়েছেন?' আমি বললুম, 'নয় তো কি?' সে বলল, 'দূর হোন আপনি।' আমাদের উত্তেজিত কথা কাটাকাটি শুনে ছুটে এল তার স্বামী। মালতী বলল, 'এই অচেনা লোকটা আমার অপমান করছে।' গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকটা দুম করে আমায় ঘুঁসি বসিয়ে দিল। আমি রেগে গিয়ে বললুম, 'খানকির জামাই, তার আবার এত রোয়াব হয়েছে?' লোকটা আমায় এলোপাথাড়ি মারতে লাগল। আমার চিৎকার শুনে গাঁয়ের লোক জড় হয়ে গেল। তারা আমায় ছাড়িয়ে নিল, মুখে চোখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করল। মাগীটা কোনও কথা না বলে মরদকে নিয়ে ঘরে গেল। কিন্তু গাঁয়ের লোক আমায় ঘিরে ধরল। জানতে চাইল, ব্যাপার কি? চায়ের দোকানে বিনা পয়সায় চা খেতে খেতে আমি ওদের আসল পরিচয় ফাঁস করে দিলুম। লোকগুলো তো বিশ্বাস করতেই চায় না। আমি একজন

মাতব্বরকে গাঁটের পয়সা খরচা করে বিপিনযশ লেনে নিয়ে এসে ব্যাপারটা ভজিয়ে দিলুম। ব্যস্, মাগীর সতী সাজার সাধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'তুমি তার কি সর্বনাশ করেছ, কেশব, তুমি নিজেও জান না।'

'করব না?' কেশব রেগে বলল, 'সে আমার জীবন নিতে গিয়েছিল, আমি প্রতিশোধ নেব না?'

'মিথ্যে কথা, সে তোমার জীবন নিতে যায়নি। সে ঐ প্রকৃতির মেয়েই নয়।'

আমার আন্তরিকতায় কেশব একটু আশ্চর্য হলো, বলল, 'ওঃ, তোমার যে দরদ উথলে পড়ল। তুমি তাকে কতটুকু জান?'

মালতীর চিঠিগুলি এক ঝলকে আমার মনে পড়ল, আমি বললুম, 'অনেকখানি।'

'তোমায় বুঝি ও উকিল পাকড়েছে?' কেশব ব্যঙ্গ করল।

'ঠিক তার উলটো,' আমি বললুম, 'আদালতে আমি তার বিরুদ্ধে ওকালতি করছি।'

'তার মানে?'

'মালতীর স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। স্বামীর বিরুদ্ধে সে নালিশ করেছে। আমি স্বামীর হয়ে লড়ছি।'

'ভাল করে লড়। আমি লড়াইয়ের আরও মালমসলা রসদ জোগাব। অমন মেয়ে হারবেই হারবে।'

এমন সময় অনুরাধা আমাদের মধ্যে এসে পড়ল, সে ন্যাকামি করে বলল, 'আপনারা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে নেগলেকট করছেন, আমি কি এমনই আগ্‌লি, যে আমার দিকে তাকিয়েও দেখবেন না?'

'কে বলে আপনি আগ্‌লি?' কেশব গদগদ হয়ে হয়ে বলল, 'আপনি আগ্‌লি হলে কি আজই রাত্রে আপনাকে 'চিন্‌চাও'-এ ডিনারে ইনভাইট করতাম?'

'ইউ আর স্বইট, মাই ডারলিং,' অনুরাধা বিগলিত হল।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা বিন্ধ্যবাসিনী এসে হাজির হল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সেই লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরণে, সিঁদুর টিপ, কপালে

টাকাপ্রমাণ সিঁদুরের চাকতি জলজল করছে, পান খেয়ে ঠোঁটটা একটু বিবর্ণ। সে একটা সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছে, তার মাথায় ঘোমটা। দরজার বাইরে রবারের চটি খুলে সে আমার বৈঠকখানায় ঢুকল। হাতজোড় করে মাথা ঝুলিয়ে ভক্তি-ভরে সে আমাকে প্রণাম করল। আমি বসতে বললে তবে সে বসল।

আমি ভদ্রতা করে বললুম, 'আসুন, এই সকালবেলা কি মনে করে?'

সে বলল, 'বাবু, আপনি আমার মেয়েকে বাঁচান।' তার কণ্ঠে আকুতি।

আমি বললুম, 'আমি কি করতে পারি?'

'আপনি সব করতে পারেন, বাবু,' সে বলল, 'একটা জোয়ান জীবন রক্ষা করতে পারেন। আপনি আমার মেয়েকে বাঁচান। সে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ঘর-বর করে মরতে বসেছে। আপনি যেমন করে পারেন এই মামলাটা মিটিয়ে দিন, বাবু। আপনার যত ফিস্ লাগে আমি নিজে থেকে শ্রীচরণে দিয়ে যাব।'

'ছি, ছি, আপনি একি বলছেন?' আমি প্রতিবাদ করলুম, 'আমি কি টাকার জন্যে লড়ছি? সহদেবের ভাই নকুল আমার বন্ধুর ড্রাইভার। সেই খাতিরে মামলাটা বিনা পয়সায় লড়ছি বললে হয়।'

'আপনি মহাশয় ব্যক্তি,' সে বলল, 'যদি অপরাধ করে থাকি মাপ করবেন। মেয়েটার ওপর দয়া করুন, বাবু। যেমন করে পারেন মামলাটা মিটিয়ে দিন।'

'আমি কি করব?'

'আপনি বললেই জামাই শুনবে, সে আপনাকে ভারী মান্য করে।'

'আপনাদের মামলা তো খারাপ নয়। কি হবে, তা বলা যায় না। অবশ্য এসব কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করা আমার ঠিক হচ্ছে না।' আমি ইতস্তত: করলাম।

'একি আদালতের কম্ম, বাবু? মেয়ে আমার মামলা করতেই চায়নি। আমিই চাপ দিয়ে মামলা করালুম, বললুম মামলার ভয়ে জামাই মিটিয়ে নেবে। কিন্তু আপনারা পিছনে দাঁড়িয়েছেন, সে জোরসে লড়ছে।'

'সে আর লড়ছে কই?' আমি বললুম, 'শুধু তো জবাব দাখিল করেছে।'

'মিথ্যে জবাব, বাবু, শুধু আমাদের হয়রানি করা।'

আমি বললুম, 'নকুল মিথ্যে বলতে পারে, কিন্তু সহদেব সত্যি আপনাদের পরিচয় জানত না।'

'তাতে কি হয়েছে, বাবু? সে তো আমার মেয়েকে গ্রহণ করেছিল। মেয়ের ওপর এখনও তার টান আছে।'

আমি চুপ করে রইলুম, কেননা বিন্ধ্যবাসিনীর কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি।

'আমি বাড়িয়ে বলছি না, বাবু, আমার মেয়ে একটি রত্ন। ওর বাবা তো হেঁজিপেঁজি লোক ছিলেন না।'

আমার কৌতূহল হল। আমি ঈষৎ লজ্জার সঙ্গে প্রশ্ন করলুম, 'কেন, হারাধনবাবু ওর বাবা নন?'

'ওমা, উনি কেন ওর বাবা হতে যাবেন? উনি তো ক'বছর হল আমার কাছে আছেন। একটা সমর্থ পুরুষ না হলে আমাদের চলে না, তাই ওঁকে আমাদের কাছে রেখেছি, ওর নাম পদবী আমাদের কাজে লাগাচ্ছি।'

'তবে?' আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম।

'ওর বাবা ছিলেন একটা ডাকসাইটে ডাক্তারবাবু।' বিন্ধ্যবাসিনী বলে চলল, 'নাম করলে সবাই চিনবে, আপনিও চিনবেন, কিন্তু আমি নাম করব না। তিনি মহৎ লোক ছিলেন, তাঁকে ছোট করবো না। তিনি আমায় সাত বছর বাঁধা রেখেছিলেন। কাকপক্ষীতেও জানতে পারেনি। তিনি নিয়মিত আমার কাছে লুকিয়ে আসতেন। আমার জন্যে আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। একলা ঘরে আমি রাজরাণী। এই সাত বছর আমি ওঁকে ছাড়া আর কাউকে জানতুম না। ঝুনু ওঁরই মেয়ে। ঝুনুকে কি ভালই না বাসতেন। মেয়ের পোড়াকপাল, ওর তিন বছর বয়সে ওঁনার মরণ হয়। ওঁনার দয়াতেই তো করে খাচ্ছি, বাবু। ওঁনার দেওয়া টাকা উড়িয়েপুড়িয়ে দিইনি, বাবু। বাড়ি ভাড়া খাটিয়ে রুজিরোজগার যোগাড় করছি।'

'ওসব কথা থাক' আমি বললুম, 'মামলায় এসব কথায় বিশেষ কিছু এসে যাবে না।'

'আমি তো মামলা লড়তে আসিনি, বাবু,' সে বলল, 'আমি মামলা মেটাতে এসেছি। ওঁনার ভারী ইচ্ছে ছিল মেয়ে যেন ভাল ঘর-বর পায়। কিন্তু পোড়াকপাল আমার, শেষ ইচ্ছা বোধহয় পূর্ণ করতে পারলুম না।'

আমার কিছুটা অনুকম্পা হল। আমি বললুম, 'সহদেব হয়ত মালতীকে ঘরে আনতে চায়, কিন্তু সমাজ যে নেবে না।'

'নিকুচি করেছে সমাজের,' বিরক্ত হয়ে বিন্ধ্যবাসিনী বলল, 'লাথি মারি ঝুঁটে সমাজকে।'

তারপর একটু দম নিয়ে বলল, 'আমি সব শুনেছি। ওদের গাঁয়ে আপনার মত মহাশয়ের অপমান করল ওরা। এমন কি ইটপাটকেল ছুঁড়েছিল।'

'আপনার মেয়ে এই অবস্থায় ওখানে থাকতে পারবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

'আমিও কি চাই ও ওখানে থাকুক, ঐ পাড়াগাঁয়ে? ও কলকাতায় থাকবে। জামাইও থাকুক কলকাতায়, আমার বাড়ি যদি অপছন্দ হয়, ফেলাট্ ভাড়া করে দেব ভাল পাড়ায়। কে জানবে, কে চিনবে এই শহর কলকাতায়?'

'আপনার প্রস্তাবটা মন্দ নয়।' আমি বললুম, 'আচ্ছা, আমি সহদেবের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

বিন্ধ্যবাসিনী আকুল হয়ে বলল, 'আপনি জোর করে বললেই ও রাজী হবে। আপনার কথা না বলতে পারবে না। আমার যত বিষয় সম্পত্তি মালতীই পাবে। তার মানে জামাই-ই পাবে। দরকার হয় বেচে দিক গাঁয়ের জমি-জিরেত। কত দামই বা হবে তার? ঐ টাকা দিয়ে নিজে কলকাতায় ছোট-খাট বাড়ি কিনতে পারে সে। টাকা কম পড়ে আমি দেব। শহরেই ওরা দুজনে ঘর বাঁধুক।'

'আচ্ছা, আমি সহদেবের সঙ্গে কথা কই।'

বিন্ধ্যবাসিনী আরও নত হয়ে প্রণাম করে চলে গেল, বলে গেল, 'অনেক আশা নিয়ে যাচ্ছি, বাবু, নৈরাশ করবেন না। চিরকাল আপনার নাম-যশ গাইব।'

বিন্ধ্যবাসিনীর আশা আমি পূর্ণ করতে পারলুম না। সেও আমার নাম-যশ গাইবার সুযোগ পেল না। সহদেবকে সমস্ত প্রস্তাব জানালুম, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করল।

সে বলল, 'স্যার, ও প্রস্তাব আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। দাদা ভিটের মায়া কাটিয়ে কলকাতা চলে এসেছে, আমি পারিনি। যত ছোট হোক, ঐ ভিটের মায়া আমি কাটাতে পারব না।'

'ভিটে রেখেও তো তুমি শহরে বাস করতে পার।'

'তা হয়ত পারি। কিন্তু সমাজে কি আমাদের ঠাঁই হবে? লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন থাকব? সব কথা আবার জানাজানি হয়ে যাবে। শহরে লোকে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে নিন্দা করবে, আড়ালে কেচ্ছা করবে।'

'কিন্তু সহদেব, তুমি তো তোমার স্ত্রীকে এখনো ভালবাস। তোমার শোবার ঘরে এখনও তার কত ছবি টাঙিয়ে রেখেছ।'

'সেটাই তো আমার যন্ত্রণা, স্যার। তাকে ভালবাসলেও তাকে আমাদের সমাজে টেনে তুলতে পারলুম না। আমি হার মানছি। লড়াই-এ আমি হেরে গেছি। দেখলেন না আপনার মতো লোক আমার জন্যে সেদিন লাঞ্ছিত হলেন।'

'তুমি যদি সত্যি তাকে ভালবাস, তবে তার জন্যে কিছু ত্যাগ করতে পারবে না।'

সহদেব খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আমায় ভুল বুঝবেন না, স্যার। আপনি গুরুজন, হয়ত আমার মনের দিকে চেয়ে, ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে, আমায় এই উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু আমি, স্যার, মালতীকে ত্যাগ করব, তার সঙ্গ সাহচর্য ত্যাগ করব, তার বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করব, কিন্তু সমাজ ত্যাগ করতে পারবো না। যে ভুল করে ফেলেছি তার সংশোধন করব। শুধু এই মামলা লড়া নয়, আমি স্থির করেছি, আমি মালতীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব, এই বিবাহ বাতিল করার জন্যে।'

'তোমার হয়ে সে মামলা আমি দায়ের করতে পারব না।' আমি বললুম 'তুমি বরং এই মামলাটিও অন্য উকিলের কাছে নিয়ে যাও। আমি নকুলকে বলে দেব। আমার কোনও খরচা দিতে হবে না। তোমরা দেরি না করে চেঞ্জ নিয়ে যাও। তোমার এ মামলা আমি করতে পারব না।'

'আপনি রাগ করছেন, স্যার,' সহদেব বলল।

'না, রাগ করিনি,' আমি বললুম, 'আমার এই মামলা চালাবার উৎসাহ পাচ্ছি না। আমি কাগজপত্র রেডি করে রাখব, তোমার নতুন উকিলবাবু চিঠি লিখলেই আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব। তার আগে মালতীর এই চিঠির গোছা তুমি নিয়ে যাও। এ চিঠি তো তোমার মামলায় কোন কাজে লাগবে না।'

আমি ড্রয়ার খুলে চিঠির গোছা সহদেবের হাতে তুলে দিলুম। চিঠি থেকে এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ এসে আমার নাকে লাগল। সেটাই যেন আমার দক্ষিণা।

চিঠির গোছা নিয়ে সহদেব মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

## দ্বিতীয় পর্ব

মালতীকে কি করে বোঝাই যে আমার চেষ্টার অভাবে তার ঘর ভাঙেনি। আমি তো সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলুম। তবু তার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি একটু জোর করলে সহদেব তাকে চিরকালের মত ত্যাগ করত না। আমি মামলাটা হাতছাড়া করে অন্যায় করেছি। মামলাটা যদি আমি হাতে রাখতুম, তাহলে সহদেব কিছুতেই বিবাহ বাতিল করার মামলা করত না, আর শেষ পর্যন্ত বিবাহ বাতিল হয়েও যেত না।

মামলাটা হাতছাড়া হয়ে যাবার পর আমি আর মালতী-সহদেবের কোন খোঁজ রাখিনি। কয়েক মাস কেটে যাবার পর মালতীই আমার কাছে এল। আমি তাকে প্রথমটা চিনতেই পারিনি। সে-ই সরাসরি অভিযোগ করল, 'আপনি চেষ্টা করলে আমার ঘর ভাঙত না, আপনার চেষ্টার অভাবে আমার ঘর ভেঙে গেল।'

আমার প্রতিবাদ সে কানেই তুলল না। পরবর্তী ঘটনা যা মালতী বলে গেল, তা গুছিয়ে লিখলে এই রকম দাঁড়ায়।

সহদেব বিবাহ বাতিলের মামলা দায়ের করল। মালতী তার বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে জবাব দাখিল করল। একসঙ্গে দুটো মামলা চলতে লাগল। কিন্তু মালতীর মনে তা দুর্বিষহ হয়ে উঠল। যে স্বামীকে সে প্রাণমন উৎসর্গ করে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলা লড়তে মালতী নারাজ। শুধু বিন্ধ্যবাসিনীর জেদের বশেই সে লড়ছিল। পরে মালতী স্থির করল মামলা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে সে নিজেই সহদেবকে অনুনয় বিনয় করবে। তাই সকলকে লুকিয়ে সে আবার সহদেবকে চিঠি লিখতে লাগল। অনুনয়ভরা চিঠি, যুক্তিতর্ক, মান-অভিমান নীতি, প্রেম, কর্তব্য—অনেক কিছু মালতী লিখে চলল। কখন কখনও তার চোখের জলে লেখা ভিজে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে উঠল। চিঠির পর চিঠি লিখল মালতী।

কিন্তু চিঠির পর চিঠি ফেরত আসতে লাগল মালতীর কাছে। কেউ সে চিঠি খুলল না, পড়ল না। ডাক-বিভাগ থেকে সে চিঠি ফেরত পাঠিয়ে দিল মালতীর কাছে। খামের উপরে লেখা—কখনও এড্রেসি আন্‌নোন্ –(হতেই পারে না, মুরলাগ্রামে সহদেব দাসকে চেনে না এমন কে আছে?), কখনও

বা লেফ্‌ট্‌ –( ও যদি চলেই যাবে তো খামের ওপরে মালতীর নাম-ঠিকানা কে লিখে দিল ? লেখা তো মালতীর অতি পরিচিত !), কখনও শুধু লেখা রিটার্নড্‌ টু সেণ্ডার। স্পষ্টই বোঝা গেল সহদেব মালতীর চিঠি গ্রহণ করছে না, খুলছে না, পড়ছে না, তবে ছিঁড়ে ফেলেও দিচ্ছে না, কৃপা করে লেখিকার চিঠি লেখিকার কাছে ফেরত দিচ্ছে, যেন বলছে, 'তুমি আর আমায় চিঠি লিখ না।'

আসল ব্যাপারটা জানবার জন্যে মালতী প্রসাদ পালের দ্বারস্থ হল। ঐ একটিমাত্র মানুষ যাকে মালতী বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে, যে সে কখনও মালতীর সঙ্গে প্রতারণা করবে না। মালতী তার প্রসাদদাকে পাঠাল মুরলাগ্রামে সহদেবের খোঁজ নেবার জন্যে ? প্রসাদকে সেখানে কেউ চেনে না, এক নকুল-সহদেব ছাড়া। প্রসাদ এসে খবর দিল, নকুল শহরে আছে, অনেক দিন গ্রামে যায়নি, কিন্তু সহদেব গ্রামেই মজুদ ছিল, অনেক দিন শহরমুখো হয়নি।

মালতী ফেরত-আসা চিঠিগুলো প্রসাদের হাত দিয়ে সহদেবের কাছে পাঠিয়েছিল। প্রসাদ সহদেবের সঙ্গে দেখা করেছিল। সহদেব তার কোনও অসম্মান করেনি। খাতির করে বাড়িতে বসিয়েছিল। নিজের হাতে ডাব পেড়ে কেটে তার মিষ্টি জল প্রসাদকে খাইয়েছিল। এমন কি মালতীর কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রসাদ চিঠিগুলি সহদেবের হাতে দিতে সে না পড়েই ওগুলি ফেরত দিল। শুধু ম্লান হেসে বলেছিল, 'যা চুকেবুকে গেছে, তার জের টেনে লাভ কি, দাদা ?' প্রসাদ আর কিছু বলতে সাহস করেনি।

সহদেব প্রসাদকে চট করে ছাড়ল না। দুপুরে খাইয়ে দিল। অনেক গল্প করল, শুধু মালতীর কথা ছাড়া। খালের ধারের জমিতে এবার ধান হয়েছে ভালোই। কেমিক্যাল সার ঠিক সময়ে পড়ায় আশ্চর্য ফলন হয়েছে। বি-ডি-ও বলেছে সহদেব হয়ত ও অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ কৃষিজীবীর পুরস্কার পেতে পারে। লাল গাইটা একটা এঁড়ে বাছুর বিইয়েছে। ডীপ-লিটার প্রথায় সহদেব বাড়িতে মুরগী পুষছে। এখন প্রায় পঁচিশটা চিক্‌স্‌ আছে। স্কুলের গণ্ডগোল মিটে গেছে। মালতীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা জেনে অভিভাবকেরা খুশী। নির্বাচনে সহদেব আবার জয়ী হয়েছে সম্পাদক হিসাবে। বিরুদ্ধ দল পরাজিত, তবে তারা মামলার ফলাফলের দিকে চেয়ে আছে। আসছে মাসে সহদেব দশ কাঠা ধানজমি কিনবে—ইত্যাদি।

এসব শুনেও মালতী দমল না। সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। তাই কাউকে না জানিয়ে মালতী চাদর মুড়ি দিয়ে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে একটা বাসে চড়ে বসল, সে বাসটা মুরলাগ্রামে পৌঁছে দেবে তাকে। সঙ্গে কোনও মালপত্র নিল না, পাছে কারুর সন্দেহ হয়। তাছাড়া তার জামাকাপড় তো স্বামীর ঘরে মজুত ছিলই। তখন সন্ধ্যা। বাসে যেতে তার ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে। তা হোক। চেনা পথ। বরং অন্ধকারই ভাল। সে লেডিস্ সীটে বসল। এদিকটায় আবছা আঁধার। ভালই হল। চেনা কেউ যেন তাকে দেখতে না পায়। এ যেন তার গোপন অভিসার। তবু সে যাচ্ছে পতিগৃহে।

বাসে সময় যেন আর কাটতে চায় না। এত আস্তে যায় কেন বাস? বোধহয় এটার শেষ ট্রিপ। তাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা যাত্রী বোঝাই করছে। বাইরেও অন্ধকার। মালতীর মনেও অন্ধকার। সে এলোপাথাড়ি ভাবতে লাগল। সহদেব যদি বাড়িতে না থাকে? থেকেও যদি সে মালতীকে ঘরে ঢুকতে না দেয়? চায়ের দোকানে সারারাত বসে কাটাবে মালতী। এতরাত্রে তো আর ফিরতি বাস পাওয়া যাবে না। সহদেব যদি তাকে ঘরে নেয়? আবার যদি তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়? ভাবতে পারে না মালতী। বাসের ঝাঁকানি আর হর্নের কর্কশ আওয়াজ তার মাথা ধরিয়ে দিল। কতদূর এল, ঠাকুরপুকুর পেরিয়ে গেছে। ফাঁকা মাঠের হাওয়ায় সে স্বস্তি বোধ করল। আমতলা, দস্তিপুর মুরলাগ্রামের বাঁকে সে নেমে পড়ল। হাটতলায় সবাইকে এড়িয়ে সে পতিগৃহে প্রবেশ করল। সে দু-চার বার হোঁচট খেল, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। আকাশে ফালি চাঁদের আলোই যথেষ্ট। একটা নেড়ি কুত্তা ঘেউ-ঘেউ করে উঠেছিল। কিন্তু বোধহয় চেনালোকের আন্দাজ পেয়ে চুপ করে গেল। বাড়িটা অন্ধকার। আঃ, একটা প্রদীপও জ্বালায়নি কেউ। যেন ভূতের বাড়ি। সহদেব বোধহয় এখনও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অফিস থেকে ফেরেনি। মালতী থাকতে সে তাড়াতাড়ি ফিরত। এখন তো আর পিছটান নেই।

ভালই হল সহদেব বাড়িতে নেই। বাড়ি ঢুকতে প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই ঘটল না। আজকাল চুরি বেড়ে গেছে. তবু সহদেব তালা লাগাবে না। মালতীর উপকারই হল। খোলা দরজা দিয়ে সে উঠানে এল। সবই তার চেনা। শোবার ঘরের দাওয়ার উপর উঠল। শোবার ঘরের শিকলি খুলল। নিজের ঘরে

ঢুকল। হাসি পেল মালতীর। একদিন সে রাজরানীর সম্মান নিয়ে এই ঘরে ঢুকেছে, আর আজ ঢুকছে চোরের মত অন্ধকারে। আলো জ্বালবে কি? কেন জ্বালবে না? সে কি সত্যি সত্যি চোর নাকি? নিজের দাবী সে অর্জন করতে এসেছে, সে আলো জ্বালবে না কেন?

একটু হাতড়াতেই সে দেখল, হারিকেন দেশলাই যেখানে থাকত, ঠিক সেখানেই আছে। ফস করে দেশলাই জ্বেলে মালতী হারিকেনটা জ্বেলে নিল। সে দেখল শোবার ঘর যেমন ছিল, তেমনই আছে। দেওয়ালে তার ছবির পর ছবি যেমন টাঙানো ছিল তেমনি টাঙানো। ড্রেসিং টেবিলে বিয়ের পরে বরবউ-এর ছবি। প্রসাধন সামগ্রীও নড়চড় হয়নি। মালতী যেন একটু আশ্বস্ত হল। বোধহয় কিছুই বদলায়নি, বদলাবেও না।

সে হাতমুখ ধোবার জন্যে বাথরুমে গেল। টিনেতে জল তোলা ছিলই। বাসের ঝাঁকানিতে গায়ে ঘাম বসে গেছে। যেন গন্ধ গন্ধ লাগছে। মালতী তোলাজলে আরাম করে গা ধুলো। সহদেব এখনও পুরনো ব্র্যাণ্ডের সাবানটা ব্যবহার করছে। এই ব্র্যাণ্ডটা মালতীই এই বাড়িতে চালু করেছিল। গামছা দিয়ে সে গা মুছল। গামছায় যেন সহদেবের গায়ের গন্ধ পাওয়া গেল।

গা ধুয়ে মালতী অনেকটা স্বস্তি বোধ করল। তার আলমারিটা চাবি দেওয়া ছিল। চাবির গোছা আনতে ভোলেনি মালতী। সে আজ ভালো করে সাজবে। সহদেবের মন ভোলাবে, উমা যেমন শিবের মন ভুলিয়েছিল। আজ সে স্বামীর মন ভোলাবে। আলমারি থেকে সে সিল্কের সুন্দর শাড়ীটা পরলো। এটা সহদেব পছন্দ করে নিউমার্কেট থেকে কিনে উপহার দিয়েছিল। ড্রেসিং টেবিলে বসে বসে সে প্রসাধন সারল। গায়ের ওপর খানিকটা সেণ্ট ছড়িয়ে দিল। ভাগ্যে এখনও সহদেব আসেনি, তাহলে মাঝ-পথে তার প্রসাধন বন্ধ হয়ে যেত। কপালে কুমকুমের ফোঁটা দিতে দিতে সে হারিকেনের আলোয় আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখল। ভালোই লাগছে দেখতে। সহদেব নিজে কতবার তার কপালে কুমকুমের ফোঁটা দিয়ে আলতোভাবে চুমু খেয়েছিল।

এবার যেন খিদে পাচ্ছিল মালতীর। সন্ধ্যায় যা হোক কিছু খেয়ে এসেছিল সে, অভিসারের উত্তেজনায় খিদের কথা ভুলে গেছল। এখন একটু স্বস্তির মধ্যে তার খিদে বেড়ে উঠল। এতক্ষণে খেয়াল হল রান্নাঘরও অন্ধকার। রাধির মা রেঁধে দিত। সে তো রাঁধতে আসেনি? তবে কি সহদেব রাত্রে বাড়িতে খাবে না? হয়ত তাই। মালতী হেঁসেলে খোঁজ নিল। কোন

খাবার চোখে পড়ল না। শুধু কিছু কাঁচা তরিতরকারী। এখন আবার রাঁধে কে? মালতী ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল।

হাতঘড়িতে দেখল রাত্রি প্রায় দশটা হল। এখনও সহদেব ফিরল না। আরও কিছু প্রতীক্ষা। মালতী ভাবল সহদেবকে চমকে দিতে হবে। সে আলোটা নিবিয়ে দিল। সে খানিকটা বসে বসে মশার কামড় খেল। গা গতর ব্যথা ব্যথা করছে। একটু গড়াতে পারলে হত। সে শোবার ঘরে ঢুকল। সে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। চাদরের বাইরে অসংখ্য মশার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। তাদের সঙ্গে তান মেলাল ঝিঁঝি পোকার ডাক।

বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল মালতীর। বাইরের দরজায় একটা আওয়াজ হতে তার ঘোর কেটে গেল। সে কান পেতে শুনল তার পরিচিত পদশব্দ। সহদেব বাড়ি ফিরেছে। মালতী তাকে অবাক করে দেবে, উঠবে না বিছানা থেকে, চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে রইল, একটু ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে দেখবার চেষ্টা করল। সহদেব টর্চ জেলে উঠানে এগিয়ে এল, জুতোজোড়া খুলে পা ধুলো, একটা ঢেকুর তুলল, একেবারে শোবার ঘরে ঢুকল, হারিকেন জালল, (আশ্চর্য!) এখনও মালতীকে দেখতে পেল না, একবার ট্রানসিস্টর রেডিওটা খুলল। কালোয়াতি গান হচ্ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে রেডিও বন্ধ করে দিল। শোবার ঘরের দরজায় খিল লাগাল, ড্রেসিং টেবিলে সাজানো তাদের বিয়ের ছবিটা একবার তুলে নিল, হারিকেনের সামনে ধরে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখল, তারপর সেটা নামিয়ে রাখল, আর একটা ঢেকুর তুলল, কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে খেল, এবার অভ্যাসমত গায়ের জামা খুলে ফেলল, আধো অন্ধকারেও তার পেশীবহুল সুঠাম দেহ মালতী চোখভরে দেখল। সহদেব আলনা থেকে একটা লুঙ্গি নিয়ে পরল, জামাকাপড় আলনায় রাখল। সে এরপর হারিকেন নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঘরে সে অভ্যাসমত শুয়ে পড়ল নিজের জায়গায়—মালতীর পাশেই।

মালতী আর থাকতে পারল না, সে দুইবাহু দিয়ে সহদেবের কণ্ঠ বেষ্টন করে তার মাথাটা নিজের বুকের ওপর টেনে নিল। সহদেব সবেগে মুক্ত করে নিল নিজেকে, সভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কে? কে?'

খিলখিল করে হেসে উঠল মালতী।

সহদেব চট্ করে হারিকেনটা জালল। তার আলোটা মালতীর মুখে

এসে পড়ল। মালতী ততক্ষণে উঠে বসেছে। সহদেব তখনও কাঁপছিল। ত্রস্তকণ্ঠে সে বলল, 'কে? মা—ল—তী! আমি ভাবলুম—'

'পেত্নী!' মালতী খুক খুক করে হাসতে লাগল।

সহদেব বলল, 'আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, এখনও আমার বুক কাঁপছে।'

'ভয় নেই,' মালতী রসিকতা করে বলল, 'আমি তোমার ঘাড় মটকাতে আসিনি।'

সহদেব ঈষৎ আশ্বস্ত হল, বলল, 'তুমি কখন এলে? আমি তো জানতেই পারিনি।'

'আমি তো জানাইনি, জানালে তুমি আসতে দিতে না, তাই না বলেকয়ে চলে এসেছি।'

সহদেব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কি তুমি চুপ করে গেলে কেন? আমার আসা তুমি চাও না? বেশ আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'না, না, তুমি এখনই যাবে কেন? কাল সকালেই বরং যেও।' সহদেব বলল, 'আমি বৈঠকখানায় গিয়ে শুচ্ছি। তুমি এই ঘরেই ঘুমও।'

'তার মানে?' মালতী বলল, 'তোমার সঙ্গে কি আমার ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ-এর সম্পর্ক? না, আমি অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ?'

'কি যে বল?' সহদেব বলল, 'আমি বাইরের ঘরেই শুই।' সে দরজার খিল খুলতে গেল।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল মালতী। সহদেবের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'কেন তুমি আমায় ত্যাগ করছ? আমি কি তোমার স্ত্রী নই? তুমি কি আমায় ভালোবাস না? আমি কি তোমায় ভালবাসি না?'

'নতুন করে আর কি কৈফিয়ৎ দেব? আমার যা বলার ছিল তোমায় সব বলা হয়েছে,' সহদেব রুদ্ধকণ্ঠে বলল।

মালতী ব্যাকুল হয়ে বলল, 'না, না, তুমি আমায় ত্যাগ কর না, আমি তাহলে বাঁচব না।'

মালতী কাঁদতে লাগল। কিন্তু সহদেব শান্ত অথচ দৃঢ় হস্তে তাকে সরিয়ে শোবার ঘরের দরজা খুলল, বাইরে বার হবার জন্যে পা বাড়াল।

মালতী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও, লোকে পোষা কুকুর বেড়ালকেও এত ঘেন্না

করে না, তুমি আমায় যতটা করছ। আমি কি তোমার ধর্মপত্নী নই? আমি কি মানুষ নই?' ...

সংযত কণ্ঠে সহদেব বলল, 'বৃথা উত্তেজিত হয়ো না, মালতী।'

মালতী সে কথায় কর্ণপাত করল না, উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগল, 'আমায় যদি এত ঘৃণা করে থাক, তবে এইমাত্র আমাদের বিয়ের ছবি নিয়ে কেন হা-হুতাশ করলে? কেন আমার ছবি এখনও ঘরের চারিদিকে টাঙিয়ে রেখেছ? বিয়েই যখন অস্বীকার করতে চাও, আমাকেই যখন ত্যাগ করতে চাও, দূর কর এইসব জঞ্জাল। তুমি না পার আমি নিজের হাতেই করছি।'

মালতী উন্মত্তের মত দেওয়াল থেকে নিজের ছবিগুলি টেনে টেনে নামাল, আছড়ে ভাঙতে লাগল মেঝের ওপর, ঝনঝন কাঁচ ভাঙার শব্দ উঠল। সে বিয়ের ছবিটা শৌখিন ফ্রেম থেকে খুলে বার করল, চড়চড় ছিঁড়ে, টুক্‌রো করে ফেলল সেটা, মেঝের ওপর ফেলে টুকরোগুলোকে পা দিয়ে পিষতে লাগল। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সহদেব, যেন কি করবে বুঝতে পারছিল না।

মালতী বই-এর আলমারী খুলে ফেলল। 'কি হবে আর বিয়ের স্মৃতি বয়ে, এ আপদগুলো বিদেয় হোক,' বলতে বলতে সে বইগুলো ইতস্তত: ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। সহদেব মালতীর করালমূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মালতীর চোখ পড়ল শয্যার উপর, সে পাগলের মত বালিশ তোশক ছুঁড়ে ফেলতে লাগল চারিদিকে। 'কি হবে এই সুখের শয্যায়?' মালতী ককিয়ে উঠল। দাঁতে করে বিছানার চাদর ছিঁড়ে কুটিপাটি করল। উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল মালতী। তার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে, কিন্তু মনে ভাবল কি করে এই আগুনে তার শান্তি হবে। হারিকেনের দিকে চোখ পড়তেই সে ছুটে গিয়ে তুলে নিল সেটাকে। অস্ফুট গর্জন করে সে বলল, 'আজ আমি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে মরব।' চক্ষের নিমেষে সে হারিকেনের ঢাকা খুলে শাড়ির ওপর কেরোসিন ছিটিয়ে দিল, অবশ্য অল্প তেলই হারিকেনে অবশিষ্ট ছিল। তারই দুর্গন্ধে ভরে গেল ঘর। তখন নিভন্ত হারিকেনটা ছিটকে পড়ল পায়ের কাছে, কাঁচের চিমনি ভেঙে চুরমার। শেষ শিখায় শাড়ীর তলার পাড়ের কাছে আগুন ধরে গেল। চক্ষের নিমেষে সহদেব ঝাঁপিয়ে পড়ল, মালতীর পা জাপটে ধরে নিজের শরীর দিয়ে ঈষৎ জ্বলন্ত শাড়ীর আগুনটা খপ্‌ করে চেপে ধরল, দুজনে গড়াগড়ি খেল মেঝের ওপর। সহদেবের দেহের চাপে দম বন্ধ হয়ে আগুনটা খপ করে নিভে গেল। ঘরে অটুট অন্ধকার। শুধু উত্তেজিত

সহদেবের দ্রুত নিঃশ্বাস আর মালতীর চাপা কান্না শোনা গেল। সহদেব অন্ধকারেই কেরোসিন-মাখা শাড়িটা খুলে দিল মালতীর দেহ থেকে। ভাগ্যে হ্যারিকেনে অল্পই তেল ছিল, শাড়ীর ভিজে দিকটায় আগুন লাগেনি। সে তোশকটা হিঁচড়ে বিছানায় তুলল, মালতীর কম্পমান দেহ সবল হাতে শুইয়ে দিল বিস্রস্ত শয্যায়। সহদেব টর্চটা জ্বেলে দেখল মালতীর দেহ কিছুটা পুড়েছে কিনা। পরীক্ষা করে সে আশ্বস্ত হল যে, শরীরের কোথাও পুড়ে যায়নি। শুধু পায়ের কাছে এক জায়গায় একটু ঝলসে গেছে।

সহদেব বলল, 'উঃ, অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেল। ছি,ছি, কি পাগলামি করছিলে বল তো?'

মালতী রোদনভরা কণ্ঠে বলল, 'আর পাগলামি করব না। তুমি এস, আমার কাছে এস।'

সহদেব তার পাশে গেল। মালতী তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করল সহদেব বাধা দিল না। মালতী চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিল সহদেবের মুখচোখ, নাককান, কপাল, গলা। সহদেব বলিষ্ঠ হাতে মালতীর বেপথু দেহ নিজের বুকের ওপর টেনে নিল। মালতী অনতিবিলম্বে স্ত্রীর অধিকার ফিরে পেল।

গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল মালতী। যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর হয়েছে, আকাশে পাতলা আলোর রেশ। সে প্রথমটা ভাবতে লাগল, কোথায় আমি। চোখ রগড়ে ভালো করে চারিদিক চেয়ে দেখল। ঘুমের ঘোর কেটে যেতে অদ্ভুত তৃপ্তিতে তার মন ভরে উঠল। গত রাত্রির যন্ত্রণা আর আনন্দ দুই-ই মনে পড়ল। মিলনের পর কখন যে সে স্বামীর বাহুতে মাথা রেখে প্রশস্ত বক্ষে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা জানতেই পারেনি। সে আশেপাশে দেখল সহদেব নেই, আগে উঠে গেছে। ভোরে ওঠা তার অভ্যেস। দীর্ঘ অবসরের পর স্বামীসম্ভোগের একটা অলস অনুভূতি তার সারা দেহে তৃপ্ত অবসাদ এনে দিয়েছিল। সে বিছানায় আরও কিছুক্ষণ গড়াল। হাই তুলল। গায়ে কাপড় নেই। পরণে শুধু শায়া আর ব্লাউস। কেমন যেন তার লজ্জা এল। সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। সহদেবের দেওয়া সিল্কের শাড়ীটা মেঝেয় লুটোচ্ছে। সে সেটাকে তুলে নিল। এক জায়গায় একটু পুড়ে গেছে। শাড়ী থেকে কেরোসিনের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। সে নাক সিঁটকে সেটাকে ফেলে দিল। আলনা থেকে ছাড়া কাপড়টা পরল।

আরও একটু আলো ফুটে উঠেছে। জানলা দিয়ে কিছু আলো পর্দা ভেদ করে

ঘরে এসে পড়েছে। মালতী ঘরের অবস্থা দেখে একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। একেবারে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। ছবিগুলি ভেঙে চুরমার। বইগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো। দুটি বালিশ মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। পায়ে একটুকরো কাঁচ ফুটতেই মালতী বসে পড়ল। সন্তর্পণে কাঁচের টুকরোটা বার করল। সে পা টিপে টিপে দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকে ঘরের ভিতর দেখে তার একবার রাগ হল নিজের ওপর। সাজানো ঘরের জিনিস পত্র সে নিজের হাতেই তচনচ করেছে পাগলের মত। আবার ভাবল ভালই করেছে। কটা জিনিস গেছে বটে, কিন্তু সে স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। খুশীতে ডগমগ হয়ে সে স্নানের ঘরের দিকে এগল। গা দিয়ে এখনও কেরোসিনের গন্ধ বেরুচ্ছে। ভাল করে সাবান মেখে স্নান করবে সে। প্রথম রাত্রের কালিমা সে মুছে ফেলবে, নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার করবে, নতুন করে ঘর সাজাবে।

সে সহদেবের খোঁজ করল এদিক ওদিক। 'এই, কোথায় তুমি? এই কোথায় গেলে?' মালতী সহদেবের উদ্দেশ্যে ডাকল। কোনও সাড়া পেল না। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছে। রাঙা গাইটা একবার ডেকে উঠল। ভোরের শান্ত পরিবেশে সে ডাকটা মালতীর ভাল লাগল, মনে হল কেউ তাকে যেন আনন্দ জানাচ্ছে।

স্নানঘরে যেতে যেতে দারুণ খিদে পেল মালতীর। মনে পড়ল কাল রাত্রে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে কাটিয়েছিল। খিদেয় পেট চনচন করতে লাগল। রান্নাঘরে আবার গিয়ে হাতড়াল। শুধু কাঁচা আনাজপাতি, নুন, তেল। হঠাৎ মনে পড়ল একটা বড় টিনে মুড়ি থাকত। নাঃ, টিনটা আছে। সে তাড়াতাড়ি ঢাকা খুলতেই মুড়ি পেল। এর সঙ্গে একটু গুড় পেলে মন্দ হত না। গুড় নেই। মালতী শুকনো মুড়ি গিলে ঢকঢক করে একগ্লাস জল গড়িয়ে খেল। সহদেবের ওপর একটু অভিমান হল। তাকে না বলে কেন সে উঠে গেল? আর গেলই বা কোথায়? এত সকালে এতক্ষণ ধরে তার কিইবা কাজ আছে? সহদেব এরকম মাঝে মাঝে করে থাকে।

কেরোসিনের গন্ধ উৎকট লাগছে। আগেই স্নান সারতে হবে। আলমারি থেকে টাটকা শাড়ী, সায়া ব্লাউজ বার করা চাই। ঘরের মেঝে কাঁচ চিকচিক করছে। আবার পায়ে ফুটল কাঁচ। মালতী দোটানায় পড়ল। আগে ঘর সাফ করে, না আগে স্নান সারে। সহদেব থাকলে সেই জামাকাপড় বার করে দিতে পারত। মালতী আর একবার ডাকল, 'এই, তুমি কোথায় গেলে?'

সহদেবের সাড়া নেই। বুকের ওপর নিজের চটিজোড়াটায় তার চোখ পড়ল। সে চটি পরে শোবার ঘরে ঢুকল। আলমারি থেকে টাটকা জামাকাপড় নিয়ে সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করল।

অনেকদিন বাদে সে আরাম করে স্নান সারবে। শহুরে বৌএর সুবিধার জন্যে সহদেব নিজে এই পাকা স্নানঘর আর সেনিটারি প্রিভি বানিয়েছিল। একটা বড় চৌবাচ্চাও ছিল। কল নেই বটে, কিন্তু সহদেব মাথা খাটিয়ে একটা কাজ চলার মত ব্যবস্থা করেছিল। টিউবওয়েলের ধারে একটি শক্ত বাঁশে তেলের খালি টিন লাগিয়েছিল। সেটা ফুটো করে একটা রবারের পাইপ আটকে দিয়েছিল। সেই পাইপটা চৌবাচ্চায় এসে পড়েছিল। টিউবওয়েল থেকে জল তুলে বালতি বালতি করে বার বার এনে চৌবাচ্চা ভরাতে হত না। বালতি করে জল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঐ টিনের মধ্যে ঢাললেই তা হুড় হুড় করে গড়িয়ে এসে চৌবাচ্চা ভরতি করে ফেলত। একাজটা সহদেব প্রায়ই নিজের হাতে করত। মালতী দেখল তখন অনেক জল ধরা রয়েছে চৌবাচ্চায়। গায়ে মাথায় তেল মেখে মালতী স্বস্তি বোধ করল। পায়ের ঝলসানো জায়গাটা জ্বালা করছিল। মালতী ভ্রূক্ষেপ করল না, ভাল করে সাবান মেখে সে ঘটি ঘটি জল ঢেলে তৃপ্তির সংগে স্নান সারল। গা মাথা মুছে টাটকা জামাকাপড় পরার পর নিজের দেহটাকে বেশ ঝরঝরে লাগল তার। চুলটা এলো করে দিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বসে বসে সে অনেকক্ষণ ধরে চুলের জোট ছাড়াবে। ভিজে জামাকাপড় উঠানে মেলে আবার সে শোবার ঘরে ঢুকল। লণ্ডভণ্ড ঘরটা যেন তাকে তিরস্কার করতে লাগল। যেন বড্ড বাড়া বাড়ি হয়ে গেছে কাল প্রথম রাত্রে। মাথায় যে কি পাগলামি ঢুকেছিল তার? সহদেব এলে মালতী বাড়াবাড়ির জন্যে ক্ষমা চাইবে। ভূলুণ্ঠিত হারিকেনটা যেন দাঁত বার করে পড়েছিল। কি সর্বনাশই সে কাল করতে চলেছিল! ভাগ্যে সহদেব ছিল কাছে। বুদ্ধি করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল তাই— নইলে এতক্ষণ—। ভাবতে পারল না মালতী। শুধু জীবনরক্ষার দরুণ কৃতজ্ঞতায় স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে উঠল। সে হারিকেনটা সন্তর্পণে সরিয়ে রাখল। আঙুল শুঁকে দেখল হাতে কেরোসিনের গন্ধ লাগেনি।

মালতী ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বসল। অন্যমনস্কভাবে সে চিরুনি দিয়ে ভিজে চুল আঁচড়াতে লাগল। মেঝের ওপর ছড়ানো ছিল বিয়ের

বরকনের ছবির টুকরোগুলো। ছি, রাগের মাথায় কেন ওটা ছিঁড়তে গেল সে। ফটোগ্রাফারের দোকান থেকে নিশ্চয় ওর একটা নতুন কপি পাওয়া যাবে। চুল আঁচড়ান ক্ষণিক বন্ধ রেখে সে ছবির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিল। যেন জিগ্‌স পাজ্‌ল। ড্রেসিং টেবিলের ওপর টুকরোগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে সম্পূর্ণ করতে চাইল, পারল না, সব টুকরো কাছাকাছি নেই। সহদেবের মুখের খানিকটা ফাঁক, মালতীর নিজের ছবিটাও অসম্পূর্ণ। ফটোর একটা কপি নিশ্চয়ই আনাতে হবে। ফ্রেমটা ত আস্তই আছে। কোথায় ফ্রেমটা? মেঝেতে নেই তো। ঐখানেই তো পড়েছিল। মালতী সেটা খুঁজতে লাগল। ঐ তো রয়েছে বিছানার ওপর। ওখানে কি করে গেল? ঘুমচোখে ভোরের আধো অন্ধকারে ওটা দেখতে পায়নি মালতী। সহদেব যে দিকটায় শুয়েছিল, সেই দিকটায় মাথার কাছে রয়েছে ফ্রেমটা। নিশ্চয় সহদেব ওটা যত্ন করে তুলে রেখেছিল। মালতী উঠে গিয়ে সেটা হাতে নিল। একি! এর তলায় রয়েছে একটা চিঠি। মানে, চিঠিটা ওই ফ্রেম দিয়ে চাপা ছিল। মালতী চট করে চিঠিটা পড়ল। সহদেবের হাতে লেখা মাত্র কটি লাইন— 'ঝুনু, হাটে যে হাঁড়ি ভেঙেছে, আমরা যতই পলেস্তারা লাগাই না কেন, তা জোড়া লাগবে না। কিন্তু তুমি যতদিন এ বাড়িতে থাকবে, আমি ততদিন এ বাড়িতে পা দেব না। আসি। সহদেব।'

মালতী চিঠিখানা দুমড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরল। তার চোখের সামনে যেন সমস্ত পৃথিবী ঘুরপাক খাচ্ছে। ভয়ানক ভূমিকম্পে যেন তার সমস্ত শরীর দুলছে। মালতী দুলছে, ঘুরছে, পড়ছে, দুলছে, ঘুরছে। উত্তাল এক প্রলয়ংকরী বন্যা যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আকাশ-সমান ঢেউগুলো তুলছে ফেলছে, ফেলছে তুলছে। তলিয়ে যাচ্ছে, মালতী তলিয়ে যাচ্ছে অগাধ উন্মত্ত জলরাশির অতল তলে।

যখন সে সম্বিত ফিরে পেল, দেখলে রাধির মা তার মাথাটা নিজের কোলের উপর রেখেছে, মাঝে মাঝে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিচ্ছে আর মাথায় তালপাতার পাখায় হাওয়া করছে। ভালই লাগছিল নরম কোল, শীতল জলবিন্দু আর ঠাণ্ডা হাওয়া। মালতীর চোখের পাতা নড়ল, রাধির মা সযত্নে ভিজে গামছা দিয়ে কপাল মুছিয়ে দিল। মালতী চোখ চাইল।

রাধির মা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'যাক, বৌদির জ্ঞান হয়েছে। বেঁচেছি।'

রাধির মা বিধবা প্রতিবেশিনী। সামান্য দক্ষিণা আর খাদ্যের বিনিময়ে সে

দুবেলা সহদেবের বাড়ি রেঁধে দিয়ে যায়, সংসারের খুচরো ফাইফরমাস খাটে। তার মেয়ে রাধির বিয়ে হয়ে গেছে। সে শ্বশুরবাড়ি থাকে। মাথা গোঁজবার একটি ভিটে আছে রাধির মার। তাতে তো পেট চলে না। তাই রাধির মা সহদেবের বাড়ি এই হালকা কাজটা নিয়েছে।

মালতী উঠে বসল। রাধির মা আপনমনে গজগজ করতে লাগল, 'এসে দেখি একটা মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ঘরে কাকপক্ষীও নেই? ডাক পাড়লুম, দাদাবাবু, দাদাবাবু, দাদাবাবু—। সাড়া নেই। ঘরের মধ্যেও লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। আমি তো ভয়ে ভিরমি খাই আর কি। রাত-বিরেতে ডাকাত পড়ল নাকি? বৌদিকে খুন করে চলে গেল বুঝি। আমি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলুম।'

মালতী চুপ করে শুনতে লাগল।

রাধির মা বলল, 'আমার চীৎকার শুনে পাড়াপিতিবেশী ছুটে এল। কিন্তু যেই দেখল বৌদির এই অবস্থা, তেনারা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। ওনারা মানুষ না শকুনি। আমি হাঁক পাড়লুন, 'কে কোথায় আছ? ডাক্তার বদ্যি ডাক, থানা পুলিশে খবর দাও।' বাঁড়ুয্যেমশায়ের শালা বললে, 'ঘরের কেচ্ছায় পুলিশ কি করবে? সহদেবই বৌকে মারধর করে পালিয়ে গেছে।' দাদাবাবু নাকি ভোর না হতে একটা বাক্স নিয়ে পেথম বাসে কলকাতায় চলে গেল, চায়ের দোকানের ছোঁড়াটা নাকি নিজের চোখে দেখেছে।'

মালতী শান্তভাবে বলল, 'না, না রাধির মা তোমার দাদাবাবু আমায় মারধোর করেনি। আমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, তাই টলে পড়ে গেছি।'

রাধির মা বললে, 'আমিও ওনাদের সঙ্গে ঝগড়া করলুম। আমার দাদাবাবু কখনও বৌকে ধরে ঠেঙাতে পারে না। সে ও রকম চাঁড়াল নয়। কিন্তু ওনারা মানতে চান না, বলেন মাগীকে দূর করে দিলেও আবার বাড়ি ঢুকেছে, সহদেব মারপিট করবে না তো কি? শোন কথা।'

মালতী মনে মনে ভাবল, সহদেব মারপিট করলে তো ভাল ছিল, মালতীকে মেরে ফেললে তো সব যন্ত্রণা চুকে যেত। কিন্তু তা তো হল না। মালতী আগুনে পুড়ে মরতে চেয়েছিল। সহদেব তাকে বাঁচাল আজীবন শুধু দগ্ধেদগ্ধে মারার জন্যে।

রাধির মা বলল 'এখন ওঠ, বৌদি। মাটি থেকে উঠে বিছানায় শোও।

আমি এখনি কিছু রেঁধেবেড়ে দি। গরম গরম খিচুড়ি রাঁধি। তুমি খেয়ে একটু সুস্থ হও।'

মালতী বলল, 'না রাধির মা, আমি এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। এবার আমি কলকাতায় ফিরে যাব।'

'সে কি কথা, বৌদি?' রাধির মা আশঙ্কা প্রকাশ করল, 'এই তোমার জ্ঞানগম্যি ছিল না। সবে চাঙ্গা হয়েছ। এর মধ্যেই কলকাতায় যাবে কি? বাসের ঝাঁকানিতে যদি আবার তুমি মাথা ঘুরে যাও। তুমি বরং আজকের দিনটা এখানে থাক।'

মালতী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এখানে আমার থাকার অধিকার নেই, রাধির মা। আমি এখানে থাকলে তোমার দাদাবাবু এ বাড়ি মাড়াবে না। আমি তাকে কেন ভিটেছাড়া করব? আমার যেখানে ঠাঁই, সেখানেই যাই।'

'দাদাবাবুর সঙ্গে বুঝি তোমার আবার ঝগড়া হয়েছে?' রাধিকার মা বলল, 'কানাকানি শুনলুম তোমরা নিজেদের মধ্যে মামলা লড়ছ। ওসব একেলে কাণ্ড মোটেই ভালো নয়, বৌদি। আমি বলি কি তোমরা মামলা মিটিয়ে ফেলো। এই ধর না, রাধির বাবার রাগ হলে আমায় কত মারত ধরত, আমরা কি নিজেদের মধ্যে মামলা করেছি? যেই রাগ পড়ে যেত, আহা, সে কত সোহাগ করত। তুমিও সোহাগ পাবে, বৌদি।'

'সকলের অবস্থা তো এক রকম হয় না, রাধির মা,' মালতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'জানি ঐ মিন্সেগুলো কেচ্ছা রটিয়ে দাদাবাবুর কান ভারী করেছে,' রাধির মা দুঃখ করল, 'নইলে এমন বোম্‌ভোলানাথ এমন সোনার পিতিমেকে হেনস্তা করে। তুমি কিছু ভেব না, বৌদি, সব ঠিক হয়ে যাবে। মা কালীর কাছে মানত কর। মা সব ঠিক করে দেবে।'

এই সরলমতি গ্রাম্য রমণীর সঙ্গে মালতী আর কি তর্ক করবে? সে উঠে পড়ল। তখনও তার মাথা ঘুরছিল, চিঠিটা মেঝেয় পড়েছিল। মালতী সেদিকে একবার দেখল। ও থাক পড়ে। ওটার কর্কশ অক্ষরগুলো মালতীর বুক চিরে খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। ঐ অক্ষরগুলো ওর বুক থেকে কখনও মুছবে না।

মালতী টলছিল। রাধির মা তাকে ধরে ফেলল। মালতী যাবেই। আর এক মুহূর্ত সে এ বাড়ীতে থাকবে না। রাধির মা বলল, 'কথা ত

শুনবে না। তুমি এই শরীর নিয়ে যাবেই। চল, তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।'

রাধির মার কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে মালতী বাস রাস্তা অবধি গেল। গ্রামের দু-চার জন লোক তাকে দেখল, তারা তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। একটু দাঁড়াতেই বাস এসে গেল।

মালতি ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা বার করে রাধির মার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'মিষ্টি খেও।'

মালতী বাসে উঠে পড়ল। সে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অপদস্থ, লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত।

বিন্দি বাড়িউলি মরিয়া হয়ে উঠল, মামলায় হারিয়ে দিয়ে জামাইকে শায়েস্তা করতে হবেই। আদালত মারফত তাকে বাধ্য করাবে স্ত্রীকে ঘরে নিতে। 'বিয়ে-সাদি করা বউ। অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে, তার উপরে আবার রেজিস্টারী করা। মানবে না বললেই হল? আদালতে জজ সাহেব মুখে করে জুতো তোলাবে। বিয়ে করা বৌকে নিতে জামাই আলবৎ বাধ্য হবে।' বিন্দি বলল।

কিন্তু বিন্দির 'ঘরের শত্তুর' হয়েছে নিজের পেটের মেয়ে। সে কিন্তু আর মামলা চালাতে চায় না। এই নিয়ে মা-মেয়ের বচসা হয়। মানে মা মেয়েকে বকাঝকা করে। মুখ বুজে থাকে মেয়ে। মাঝে মাঝে ঐ এক কথাই বলে, 'হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে, পলেস্তারা দিয়ে তা জোড়া দেওয়া যাবে না।' সহদেবের কথাটাই মালতী কাতরভাবে পুনরুক্তি করে। কিন্তু বিন্দি বাড়িউলি সে কথা কানে তোলে না।

'হ্যাঁ বাবু, এমন কোনও আইন আছে যে বেশ্যার মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না?' সে উকিলবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'জানি এমন কোনও আইন নেই। ফরড নাকি? ফোরটোয়েন্টি—যাকে বলে প্রতারণা—ঠকানো, তঞ্চকতা। কোথায় আমি জামাইকে ঠকিয়েছি? জামাইয়ের দাদা আমার মেয়েকে বিয়ে-সাদি করতে চায়নি? মেয়েই তো বেঁকে বসল লোকটা লোচ্চা বলে। জামাই তো জেনেশুনে বিয়ে করেছে। বিন্দি বাড়িউলি নিজের বাড়ি বিপিন যশ জেনে ঘটা করে বিয়ে দিয়েছে, কয়েক শ' লোক খেয়েছে। কত বাবুরা এয়েছেন, বাড়িউলিরা এয়েছেন, থানার বড়বাবু, ছোটবাবু, সেপাইরা এয়েছেন, এম-এল-এ বাবুরা এয়েছেন, পাত পেড়ে খেয়ে গেছেন, পার্টির নেতারা এয়েছেন, কই কেউ

তো বেশ্যাবাড়ির অন্ন খেতে আপত্তি করেননি। আর কোন্ সমাজে কে কি বলল, অমনি ঘরের সতীলক্ষ্মী বউকে ত্যাগ করতে হবে? এ কোনদিশি ন্যায়ধম্ম? জামাইয়ের দাদা যদি এ বিয়ে করতে লজ্জা না পায়, জামাই বিয়ে করে কেন লজ্জা পাবে? কেন মিথ্যে করে বলবে আমরা ঠকিয়েছি। আমি নিজে কাঠগড়ায় দাঁড়াব। নিজে সাক্ষী দেব। হতে পারে আমার চরিত্তির খারাপ। কিন্তু তাই বলে আমি মিছে কথা বলব কেন? হ্যাঁ, আমরা হরেক মিছে কথা বলি, সে সোহাগ করবার সময়, বাবুদের কাছে টাকাটা গয়নাটা বকসিস্ নেবার সময়। তা বলে মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, জীবনমরণের সমিস্তে, আমি জজ সাহেবের কাছে মিছে কথা বলব কেন? জজ সাহেব কি বেশ্যা বলে, বাড়িউলি বলে আমায় অবিশ্বেস করবে?'

বিন্দিবাড়িউলি উকিলবাবুর কাছে বলে চলল, 'তার ওপরে আছে জামাইয়ের চিঠি। ওঃ, কি সোহাগভরা চিঠি। তার লাইনে লাইনে কাব্যি! চাষার পো এত কাব্যি শিখল কি করে? এ বাবু, ঐ সিনেমার শিক্ষে, নাটক নবেল পড়ার শিক্ষে। এই মেয়ে, তোর সোয়ামীর চিঠিগুলো দিয়েছিস উকিলবাবুকে?'

মালতী মাথা নেড়ে জানাল 'না।'

'সে কি রে? তোকে পয় পয় করে বললুম চিঠিগুলো উকিলবাবুকে দে। কথা কানে গেলনি। বাবু, চিঠিগুলো পড়লে দেখতেন জামাই আমাদের ব্যাপার সবই জানতো। সে বিয়ের আগে লিখেছিল, পাঁকে পদ্মফুল জন্মায়, তুমি আমার সেই পদ্ম।'

মালতী ঈষৎ মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করল, 'না মা, বিয়ের আগে নয়, বিয়ের পরে উনি ঐ চিঠি লেখেন।'

'ওই হল একই কথা। বিয়ের আগে আর পরে কি এসে যায়?'

'অনেক এসে যায়,' উকিলবাবু বললেন, 'অন্ততঃ ও পক্ষ বলতে পারে, আমি বিয়ের আগে ওদের আসল পরিচয় জানতুম না।'

বিন্দি একটু থতমত খেয়ে বলল, 'বিয়ের পরে তো নিশ্চয় জেনেছিল। জামাই কি চিঠিতে অংবং মন্তর লেখেনি,—ইস্তিরি রত্নং দুষ্কুলাদপি। এই মেয়ে, দে না চিঠিগুলো উকিলবাবুকে।'

'চিঠিগুলো নেই মা,' মালতী বলল।

'এই খেয়েছে!' বিন্দি বলল, 'বাড়িতে ফেলে এসেছিস বুঝি?'

'না, মা' মালতী বলল, 'সেদিন চিঠিগুলো আমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।'

বিন্দি গালে হাত দিয়ে বলল, 'অবাক করলি, মেয়ে। অতগুনো পত্তর, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিস ? তবে মামলা লড়বি কি করে ?'

'আমি তো আর মামলা লড়তে চাই না,' মালতী বলল।

'মামলা তোকে লড়তেই হবে,' বিন্দি জেদ করে বলল, 'মামলায় তোকে জিততেই হবে। দরকার হলে আমি জজ সাহেবের বাড়ি অবধি যাব। গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরব।'

উকিলবাবু এবার ধমক দিলেন, 'খবরদার, ওসব কাজ কখনও করবে না। তাহলে কনটেম্প্‌ট্‌ অফ কোর্ট। আদালত অবমাননার জন্যে তোমায় জেলে যেতে হবে।'

'তাই যাব, বাবু, তাই যাব। মেয়ের বিয়ের কেলেংকারী নিয়ে আমি আমাদের সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। বাড়িউলিরা দুঃখু জানাবার অছিলায় আমায় নিয়ে হাসাহাসি করছে। ভাড়াটে মেয়েগুলো বলছে, মেয়ের বিয়ের সাধ তো মিটল, এবার নিজের মেয়েকে খাটিয়ে পয়সা রোজগার কর। আমার উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেছে। আর ঘরের শত্তুর বিভীষণ, এই মেয়ে বলে কিনা মামলা লড়তে চাইনে। মলো যা। যার তরে চুরি করি সেই বলে চোর !'

উকিলবাবু বললেন, 'এবার কাজের কথায় এস। তোমার বক্তব্য শুনলুম। যা তুমি এভিডেন্স দিতে চাও, আমার জুনিয়ার সংক্ষেপে সেটা বাংলায় লিখে দেবে। ভাল করে সেটা পড়ে তৈরী হয়ে আসবে। কাঠগড়ায় আজেবাজে কথা বলবে না। তাহলে ভালো মামলা কেঁচে যাবে। এবার ঝুনু দাসীর এভিডেন্স। সেই আসল সাক্ষী। বল, তোমার কথা শুনি।'

মালতী বলল, 'আমি আর কি বলব ? আমার বলার কিছু নেই।'

'সে কি, তোমার বিয়ে নিয়ে মামলা, তুমি এভিডেন্স না দিলে হয় ? মামলার অনেকটা ঠিক সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করছে। ওথ এগেনস্ট্‌ ওথ। শুধু কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ নিয়ে তো মামলা নয়। কার মুখের কথা জজ সাহেব বিশ্বাস করবেন তারই ওপর মামলার ফলাফল নির্ভর করছে।'

'আমি সাক্ষ্য দিতে পারব না,' মালতী বলল।

'তাও কি একটা কথা নাকি ?' উকিলবাবু বললেন। 'ভয় কি তোমার ? আমি হাজির থাকব। ও পক্ষের ব্যারিষ্টার উলটোপালটা জেরা করলে আমি

আপত্তি তুলব। জজ সাহেব তাঁকে ধমক দেবেন। তোমার কোনও ভয় নেই।'

মালতী বলল, 'আমি সাক্ষ্য দেব না।'

'ছি, ছি দু-দুটো মামলা, তুমি সাক্ষ্য না দিলে চলে? তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? শুনেছি তুমি কত থিয়েটার করেছ, কত অডিয়েন্স ফেস করেছ। মনে কর এটাও একটা থিয়েটার, মনে কর তুমি একটিং করছ।'

মনে মনে হাসল মালতী। জীবন মরণের সমস্যা নিয়ে থিয়েটার—একটিং! সে চুপ করে রইল।

বিন্দি বলল, 'ও বেটি ঠিক সাক্ষী দেবে, উকিলবাবু। আপনি তো সব শুনলেন। ওকে কি বলতে হবে একটা লিখে দেবেন। ও ঠিক মুখস্থ করে আসবে। কত বড় বড় পার্ট ও মুখস্থ করে গড়গড় বলে যেতে পারে, আর এটা পারবে না?'

উকিলবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আমার জুনিয়ার এর সাক্ষ্যও একটা লিখে দেবে। সেটা ভাল করে পড়ে আসবে, কেমন? তাতেই মামলার জিত অব্যর্থ।'

কনসালটেসন সেরে ওরা যখন উকিলবাবুর বাড়ি থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরল, সারা সময় বিন্দি বাড়িউলি মেয়েকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করল। 'বেইমান' 'বেআক্কেলে' আরও কত খারাপ গালি। কেন সে চিঠি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে? কেন সাক্ষ্য দিতে চায় না? এইসব প্রশ্ন। একটা জোচ্চোর বিয়ে করে অত টাকা যৌতুক মেরে দিল, আসবাবপত্র, বরাভরণ ঘড়ি, আংটি, সাইকেল। জোচ্চোরটাকে শায়েস্তা করতে হবে না? মালতী, মুখ বুজে সহ্য করে গেল।

পরে হারাধন মিত্র বলল, 'ও পক্ষ বড় ব্যারিষ্টার দিচ্ছে। আমরা শুধু উকিল দেব? আমাদেরও চাই ও পক্ষের চেয়ে বড় ব্যারিষ্টার।'

'তাতে মামলা ভাল হবে?' বিন্দি প্রশ্ন করল।

'আলবাৎ হবে।' হারাধন বলল, 'ভারে কাটবে।'

'কত খরচ পড়বে?' বিন্দি জিজ্ঞেস করল।

'তা অনেক পড়বে। দু দুটো মামলা। সস্তায় সারা যায় নাকি? কদিন মামলা চলবে তার ঠিক নেই। এক একদিন ব্যারিষ্টার সাহেব পঞ্চাশ মোহর করে চার্জ করবে।'

'সর্বরক্ষে,' বিন্দি বলল, 'আমার ঘরে তো অত মোহর নেই। অত সোনার মোহর পাই কোথা? রূপোর টাকাই জোটান যায় না তো সোনার মোহর।'

হারাধন ভারিক্কী চালে বলল, 'তোরা মেয়েছেলে, এসব কোর্ট-কাছারির কি বুঝিস? সত্যি কি আর সোনার মোহর গুনে গুনে দিতে হবে? তার মূল্য দিতে হবে কাগজের নোটে। এক এক মোহরের মূল্য শতের টাকা।'

'তাতেও ত অনেক টাকা পড়বে।' বিন্দি ত্রস্ত হয়ে বলল, 'দুটো মামলায় এর মধ্যেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে।'

'লড়তে গেলে টাকা ঢালতে হয়,' হারাধন বলল, 'মাগীদের নিয়ে ফুর্তি করতে গেলে কত টাকা লাগে আর মামলা লড়তে টাকা লাগবে না? সে কি মুফতে হবে। তোরা কিচ্ছু বুঝিস না। তবে উকিলবাবু বলেছেন, ব্যারিস্টার সাহেবের বাবুকে ধরে ফিটা কিছু ছাড়িয়ে নেবেন।'

'বল কি গো,' বিন্দি অবাক হলো, 'আমাদের মত ব্যারিস্টার সাহেবদেরও বাবু থাকে?'

'দূর মাগি,' হারাধন বলল, 'এ বাবু সে বাবু নয়। এ বাবু হল সাহেবের ক্লার্ক। সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও দক্ষিণা দিতে হয়।'

'আমি মুখ্যু মনিষ্যি, অত আইন কেতা বুঝিনে। মামলায় যদি জিত হয় তো ব্যারিস্টারকে মুজরো দাও।'

দু দুটো মামলা বেশ জমে উঠলো। মালতীর পক্ষে উকিল ব্যারিস্টার। জলের মত টাকা খরচ হতে লাগল। একদিন ঘটা করে কন্‌সাল্‌টেশন হল ব্যরিষ্টার সাহেবের চেম্বারে।

ঘরের ছাদ অবধি বইয়ের আলমারি। মোটা মোটা বাঁধান বই, প্রায় সব একরকম দেখতে। এত বই মালতী একসঙ্গে দেখেনি। হকচকিয়ে গেল সে। রাশভারি ব্যারিষ্টার মিষ্টার ওয়াই সামন্ত—যাকে বাংলায় বলে শ্রীযতীন্দ্র সামন্ত—ঠোঁটের পাশে পাইপ ঝুলিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বাংলা বললেন, যার অনেক কথা মালতী বুঝতেই পারল না। আলোচনা মোটামুটি পূর্ববৎ। মালতী মিন মিন করে বলেছিল, সে সাক্ষ্য দিতে পারবে না। বাজখাঁই গলায় সাহেব এক ধমক দিলেন, উকিলবাবুকে বললেন, 'মক্কেলই যদি হস্‌টাইল উইট্‌নেস্‌ হয়, তবে ফিরিয়ে নিয়ে যান ব্রীফ্‌, কোর্টে লাফিংস্টক করবেন আমায়?' উকিলবাবু আমতা আমতা করে বললেন 'ছেলেমানুষ! অনেক

কষ্ট পাচ্ছে, তাই এত ভয়।' সাহেব খুশী হয়ে খুক খুক করে মেপে মেপে হাসলেন। বললেন, 'ডোণ্ট বি এ্যাফরেড্।' সাহেব মোটা বই খুললেন, সেটা দেখে হুকুম করতেই জুনিয়ারেরা আলমারি থেকে গোটা কয়েক মোটা মোটা বই নামাল। এক এক করে সেগুলো থেকে ইংরাজিতে কিছু পড়া হল, নথিপত্রে কিছু নোট লেখা হল। মালতী এসব আলোচনার বিন্দুবিসর্গ বুঝল না। শেষে ঠিক হল যে দুটো মামলা একই দিনে শুনানী হবে, একটার পর একটা, এই রকম প্রার্থনা ব্যারিষ্টার সাহেব জজ সাহেবের কাছে পেশ করবেন। এতে কাজের নাকি সুবিধে হবে। দরকার হলে এক সাক্ষ্যও কাজে লাগান যেতে পারে। এতে টাকা কম খরচ হবে, ঝামেলাও কম। অনেক রাত্রে সাহেবের বাড়ি থেকে ওরা ছাড়া পেল।

ব্যারিষ্টার সাহেবের প্রার্থনা মঞ্জুর হল। জজ সাহেব দিন দিলেন মামলায়, যেদিন দুটি মামলা, লিস্টে থাকবে একটার পর একটা। শুনানীর দিন এগিয়ে এল। ক্যালেণ্ডারের তারিখ গুনল মালতী। দশই ডিসেম্বর শুনানীর দিন। সকাল থেকে বাড়িসুদ্ধ সবাই আদালতে যাবার জন্যে তৈরী হল। মার কাছে তাড়া খেয়ে মালতীও সাজগোজ করে নিল। আটপৌরে সাজ, সাদাসিধে পোশাক। ঠিক দশটার সময় ট্যাক্সি হাজির হল, হারাধন মিত্র হাঁকডাক করল। বিন্দি বাড়িউলি মাকালীর ছবিতে প্রণাম করল। মামলায় জিত হলে জোড়া পাঁঠা মানত করল। হারাধন বিন্দিকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে গেল। মালতীর নামতে কিছু দেরী হচ্ছিল। হারাধন চেঁচামেচি করছিল।

মালতী কোন গর্জনে কর্ণপাত করল না। সে মনস্থির করে ফেলেছিল। সে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির পাশের এঁদো গলিটায় বেরল। স্তূপীকৃত জঞ্জাল মাড়িয়ে, হোঁচট খাওয়া সামলে পাশের একটা সরু পথ ধরল, তারপর এ গলি সে গলি করে বড় রাস্তায় পড়ল। তখন দশটা বেজে গেছে। রাস্তায় অফিসযাত্রীর জনস্রোত। সেই ভিড়ের মধ্যে মালতী নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। জনতার মধ্যে মিশে সে হাঁটতে লাগল। হাঁটছে তো হাঁটছেই, উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াল, চলতে চলতে সে গড়ের মাঠে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। অনেকক্ষণ চলে সে হাঁফিয়ে পড়েছিল, একটা ফাঁকা বেঞ্চ পেয়ে সে বসে পড়ল। নদীতে জাহাজ, নৌকা, গাদাবোট ঝকঝক করছে। কুলি, খালাসী, মাঝিরা চেঁচামেচি করছে। পিছনের রাস্তায় লরি, বাস, ট্যাক্সি,

মোটরকার ছুটে যাচ্ছে। মালতী অর্থহীনভাবে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, রকমারি শব্দ এক কানে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তার মনে একটিমাত্র দৃঢ় সঙ্কল্প—সে মামলা লড়বে না, লড়বে না, লড়বে না।

বলা বাহুল্য, সেদিন মালতীর মামলা খারিজ হয়ে গেল। আর সহদেবের মামলায় একতরফা রায় হল। ওদের বিবাহ বাতিল হয়ে গেল।

গল্পের খাতিরে মালতীর কাহিনী এই খানেই শেষ করলে হত। কিন্তু মালতী তো কাল্পনিক নায়িকা নয়, সে বাস্তব, বোধহয় রূঢ় বাস্তব। সত্যি বলতে কি, মালতীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর।

সে-ই এসে আমার কাছে অভিযোগ করল, 'আপনি চেষ্টা করলে আমার ঘর ভাঙত না, আপনার চেষ্টার অভাবে আমার ঘর ভেঙে গেল।'

তার এই ভুল ধারণা আমি নিরসন করি কি করে?

মালতী ঝোঁকের মাথায় বলে চলল, 'জানেন, ঘর বাঁধার শখ আমার অনেকদিনের। আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি, সেখানে কেউ ঘর বাঁধতে পারে না। ক্ষণিকের পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, আদর, সোহাগ, লেনদেন, ব্যস। বড় জোর কোনও মেয়ে কিছুদিন বাঁধা রইল। রক্ষিতা। কিন্তু সে আর কতদিন? তাসের ঘর, যে কোনদিন ভেঙে যেতে পারে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি, যেখানে নারী-পুরুষ ঘর বেঁধেছে। একসঙ্গে থাকছে, খাচ্ছে, শুচ্ছে, ঝগড়া করছে, ভালবাসছে। আমার এক দিদি বিয়ে করে কত সুখে আছে। আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আমার কপালে সুখ নেই।'

'তোমার আবার দিদি আছে নাকি?'

'আপন দিদি নয়। আমার মাসতুতো বোন।'

'তোমার আবার মাসী আছে নাকি?'

'আছে বৈকি। দেশে—মেদিনীপুরে। মাসী তো আমার মার মত বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেনি। মা বোকার মত পালিয়ে এসেছিল।'

মালতী হঠাৎ আমায় বলে বসল, 'দেখুন, আমায় একটা চাকরি করে দিতে পারেন? ভাল চাকরি। ভাল মানে, টাকা পয়সা অনেক, সে রকম বলছি না। যে চাকরি আমি সম্মান বাঁচিয়ে করতে পারব, সেই রকম।'

'মালতী, তুমি চাকরি করবে?'

'হাঁ! আমার অবশ্য যোগ্যতা সামান্য। আমি অল্পসল্প গাইতে পারি, নাচতে পারি, অভিনয় করতে পারি, সামান্য সেলাই-ফোঁড়াই, রান্না জানি। কিন্তু লেখাপড়া তো বেশী-দূর করিনি। কি চাকরি করি বলুন তো।'

'তুমি তো ভাল অভিনয় করতে পার।' আমি বললুম, 'আমার বইএ রূপসীর পার্ট তুমি অপূর্ব করেছিলে।'

'নটীবৃত্তি?' মালতী ম্লান হেসে বলল 'আর নয়।'

'কেন?'

'আমি যা নই, তা লোকের সামনে তুলে ধরতে হবে? এই মিথ্যে যত ভাল করে তুলে ধরতে পারব, ততই পাব হাততালি। কিন্তু আমি যা, তা কি লোকে খুশীমনে কখনও গ্রহণ করবে না, বা করতে চাইলেও পারবে না?'

'তাই তো ভাবিয়ে তুললে। কি কাজ তুমি করতে পার আত্মসম্মান বাঁচিয়ে? শিক্ষয়িত্রী—?

'পাগল হয়েছেন, রাজ্যের লোক আমার পিছনে লাগবে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাঁক তুলবে, নোংরা ছিটিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে।'

'তা যা বলেছ। রেডিওয় অডিশন দিয়েছ?'

'মন্দ বলেন নি। ওটা একবার দিয়ে দেখি। কিন্তু ওতে সফল হলে যে নিয়মিত প্রোগ্রাম পাব তার মানে নেই। আবার লেখাপড়া শুরু করেছি,' সে বলল।

আমি বললুম, 'লেখাপড়া করলেই যে চাকরি পাবে, তার, গ্যারান্টি কি? হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট, এম-এ, ইন্‌জিনিয়ার বেকার বসে আছে। আমার কাছেই কতজন আসে সুপারিশের জন্যে, সার্টিফিকেট নেবার জন্যে। কত উচ্চ-শিক্ষিতা, গুণী মেয়েরাও আসে। কিন্তু ক'জনের চাকরি হয়?'

'তবে করি কি, বলুন?' মালতী হতাশ হয়ে বলল।

'তুমি চাকরি চাকরি করে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? তোমার চাকরির দরকার কি?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'বলেন কি? দরকার নেই?' মালতী ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'বাড়ি আমার কাছে বিষাক্ত লাগছে। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে, যত তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, ততই আমার মঙ্গল।'

'কেন? তুমি বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান—'

মালতী বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'আর বলবেন না, ঐ সব লজ্জার কথা।

এক একবার মনে হয়, আমি জন্মেই মরলুম না কেন? মা-র পেটে তো অনেকগুলি এসেছিল। মা সেগুলো নষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু নষ্ট হয়ে তারা বেঁচে গেছে। আর আমি বেঁচে নষ্ট হচ্ছি।'

'কেন? মা-র সঙ্গে কি তোমার বনিবনা হচ্ছে না?'

'মোটেই না। মা যে কি চায়, তা বুঝতে পারছি না। আপনাকে আমার কথা কতদূর বলেছি? ও—হ্যাঁ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি গঙ্গার ধারে চললুম, ঐ পর্যন্ত।'

'আরও বলেছ মামলা দুটির পরিণতির কথা।'

'সে তো অনেক পরে জানলুম। শুনুন না, আরও কি সব হল।'

মালতী তার কাহিনী শেষ করতে চাইল না। আবার সে নিজের কথা বলে চলল। একটা টেপ রেকর্ডার থাকলে তার জীবনটা ধরে রাখতে পারতুম। নেই তো। তাই স্মৃতি থেকেই আমি তার নিজের ভাষায় লিখছি।

বাড়ি ফিরতেই মালতী দেখল একপাল মেয়েছেলে বাড়িতে গিজগিজ করছে। সে কয়েকজনকে চিনত। তারা মায়ের ভাড়াটিয়া। বাকি সব নতুন মুখ। মালতীকে দেখে কেউ মুচকি হাসল। এ ওর তার গা টিপল, চোখ মারল। মেনকা বলে মেয়েটা খ্যানখ্যান করে বলে উঠল, 'কোথায় গেছলে দিদি? তোমার মার যে ফিট হল। সেই যে তুমি উধাও হলে তোমার মা ট্যাক্সিতে জ্ঞান-গম্যি হারাল। বড়বাবু চেঁচামেঁচি করতে পাড়ার লোক এসে ধরাধরি করে ওনাকে ঘরে শোয়াল। ভাগ্যি খবর পেয়ে মেয়েদের নিয়ে আমি এসে পড়লু। নইলে বড়বাবু কাছারিতে যেতে পারতনি। মেধো ডাক্তার এলো। নাড়ী টিপে বললে, 'ও কিছু না, আঁতে ঘা লাগায় মাথা টলে গেছে, আমি একটা পুরিয়া দিচ্ছি। একটু জ্ঞান হলে ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দে। কোথায় গেছলে দিদি?

বিন্দি রোজই একটু একটু ব্র্যাণ্ডি খায়। এ তার অনেকদিনের অভ্যাস। কিন্তু বেশী খেলে তার নেশা হয়ে যায়।

মালতী বলল, 'গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছলুম।'

'এই তোমার বেড়াবার সময় হল?' মেনকা ঝংকার দিল, 'আমার একশ টাকা দিলেও আমি এ সময় কোনও বাবুর সঙ্গে বেড়াতে যাবনি।'

'মা কেমন?'

'খুব ভাল! যাও না কাছে। মামলায় হার, বড়বাবু ফোন করেছিলেন,

কাছারি থেকে। বিন্দিমা তারপর থেকে বকে চলেছেন, হক না হক আমার চুলের মুঠি ধরে টানলেন, এই নতুন মেয়ে সন্ধ্যেকে নাথির পর নাথি মারলেন, সে নাকি পা টিপছিল যা তা করে। বিন্দিমার হুকুম, তুমি বাড়ি ফিরলেই তোমাকে যেন আমরা ধরে নি যাই।'

'ধরে নিয়ে যেতে হবে না, মেনকা। চল যাই,' বলল মালতী।

যেন অপরাধিনীকে গ্রেফতার করে নিয়ে ইন্সপেক্টর চলল দারোগার কাছে। পিছনে একপাল উৎসুক মেয়েছেলে।

শোবার ঘরে একটা মাদুরের উপর চিৎ হয়ে এলিয়ে পড়েছিল বিন্ধ্যবাসিনী। প্রায় উলঙ্গ তার স্থূল দেহ, মাত্র কোমরের তলায় এক টুকরো কাপড় তার অবশিষ্ট লজ্জা নিবারণ করছিল। একটি মেয়ে তার পদসেবা করছিল, অন্য জন তার হাত টিপছিল, আর হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করছিল। মাথার ওপর ফ্যানটি পুরোদমে ঘুরছিল। এই শীতের অপরাহ্নেও। পাশে মদের গ্লাস, আর ব্র্যাণ্ডির বোতল প্রায় খালি।

পদশব্দ শুনে বিন্ধ্যবাসিনী চোখ পিটপিট করে মিনমিনে গলায় বলল, 'ওলো মেনকা, ভালমানুষের বেটী ঘরে ফিরল, তোরা শাঁখ বাজা, উলুধ্বনি দে।'

ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিন্ধ্যবাসিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনতে পাচ্ছিস না হারামজাদিরা, তোরা শাঁখ বাজা আর উলুধ্বনি দে।'

মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে উলুধ্বনি দিতে লাগল। মেনকা পাশের ঠাকুর ঘর থেকে শাঁখ নিয়ে এল, মহা উৎসাহে বাজাতে লাগল।

'এই চিন্তা হতচ্ছাড়ি,' বিন্ধবাসিনী বলল, 'ঠাকুরঘরে ধুনুচি আছে চট করে জ্বাল। ভালমানুষের বেটির সামনে ধুনুচি নাচ নেচে দে, যেমন এবার সার্বজনীন দুর্গো পুজোয় করেছিলি।'

চিন্তা নামে মেয়েটি হুকুম তামিল করতে ছুটল।

বিন্ধ্যবাসিনী বলল, 'আহা, উমা আমার ঘরে এল, তাকে আবহান করতে হবে না?'

ইতোমধ্যে চিন্তা ধুনুচি জেলে আনল। চাপ চাপ ধোঁয়া উঠছিল, নাকে গেল ধূনোর সুগন্ধ। মেয়েরা জায়গা করে দিল। চিন্তা কোমরে কাপড় জড়িয়ে ধুনুচি নিয়ে নাচতে লাগল অল্পপরিসর জায়গায় মালতীকে উদ্দেশ্য

করে। মালতী কাঠের পুতুলের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিন্ধ্যবাসিনী স্থির নেত্রে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাচ শেষ হল।

বিন্ধ্যবাসিনী উঠে বসল। সে কৃত্রিম আনন্দের সঙ্গে বলল, 'ওরে আজ আমার কি খুশির দিন! আমার মেয়ে আজ স্বাধীন হল, বিয়ের ছেকল কেটে খাঁচার পাখী এবার আকাশে উড়বে। কিন্তু ও কি? পাখীর সিঁথের সিঁদুর কেন? ও যে ছেকলের দাগ, মুছে ফেল, মুছে ফেল।'

মালতী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'এ সিঁদুর আমি মুছব না, মা। যতই যাই হোক্, আমি মুছব না।'

হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল বিন্ধ্যবাসিনী। বলল, 'শুনেছিস মেনকা? শুনেছিস চিন্তা? ভালমানুষের বেটী বলে কি? তোরা যেমন মাঝে মাঝে সিঁথের সিঁদুর দিয়ে টেরামে বাসে পার্কে বাগানে বাবুশিকারে যাস্, পরস্ত্রী মনে করে বাবুরা চটপট ঢলে পড়ে, টোপ গেলে, ভালমানুষের বেটী তোদের রাস্তা ধরবে রে। সোয়ামী নেই, তালাক দিল, তবু কনে বৌ সাজবার সাধ। মুছে ফেল, মুছে ফেল বলছি সিঁথের সিঁদুর।'

'না আমি মুছব না।' মালতী নিজের সংকল্পে অটুট।

'তবে রে হতচ্ছাড়ি, চোখখাগি, খানকির বেটী,' বিন্দী খেঁকিয়ে উঠল, 'ফের কথার অবাধ্যতা। এই চিন্তে, এই মেনকা, আমার হুকুম, মাগীর বৌ সাজার সাধ ঘুচিয়ে দে। মুছে ফেল ঐ সিঁথির সিঁদুর।'

মেনকা বলল, 'কেন ঝামেলা করছ, দিদি? মা যা বলছে তাই শোন।'

মালতী বলল, 'না আমি মুছব না।'

'ওরে তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' বিন্ধ্যবাসিনী কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'তোরা জোর করে মুছিয়ে দে।'

কয়েকটি মেয়ে মালতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মালতী বাধা দিতে গেল। কিন্তু অতগুলি হিংসুটে মেয়ের সঙ্গে পারবে কেন? সে মেঝেয় পড়ে গেল। হাত পা ছুড়তে গেল, পারল না। মেয়েরা তার হাত-পা চেপে ধরল। মেয়েরা আঁচল দিয়ে ঘষে মালতীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিল। ধস্তাধস্তিতে মালতীর হাতের শাঁখা ফট্ করে ভেঙে গেল। বিন্ধ্যবাসিনীর কানে এই শব্দ যেতেই সে বলল, 'বেশ হয়েছে' শাঁখা ভেঙেছে। অন্য হাতের শাঁখাটাও ভেঙে দে চুরমার কর।'

মেনকা দ্রুত আজ্ঞাবহন করল।

বিন্ধ্য বলল, 'খুলে নে, নে খুলে ওর নোয়া।'

মেয়েরা জোর করে ওর নোয়া খুলে নিল। মালতীর হাত ছড়ে গেল টানাটানিতে।

বিন্ধ্যবাসিনী এইবার চরম আঘাত হানল। সে বলল, 'ওরে মেনকা ছুড়িটাকে ধুতি পরিয়ে দে, শাড়ী খুলে নে, ওর বিধবার সাজটা পুরো হোক। নিয়ম রক্ষে তো করতে হবে। এই আনলায় বাবুর একটা কালোপেড়ে ধুতি আছে, সেটা পরিয়ে দে, সোনা মানিক আমার।'

মালতীর চোখ ফেটে জল আসছিল। তবু সে কাঁদল না, ফুঁসতে লাগল। মেয়েরা ততক্ষণে তার শাড়ী খুলে ফেলেছিল। শুধু সায়া আর ব্লাউজ তার পরণে। মেনকা একটা ভাঁজ করা ধুতি এনে দিল।

মালতী বাধা দিল না। মেয়েরা তাকে ধুতিটা পরিয়ে দিল শাড়ীর মত করে।

সে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'অনেক লাঞ্ছনা তো সয়েছি, মা, তুমি আমায় এমন অপমান করছ কেন?'

'লজ্জা করে না.' বিন্ধ্যবাসিনী গর্জে উঠল, 'মায়ের মাথা হেঁট করে দিলি। সমাজে ঢি-ঢি পড়ে গেছে বিন্দি বাড়িউলির থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে। বিন্দি বাড়িউলি কখনও হারেনি, একটা শালা জোচ্চোর ছোঁড়ার কাছে হার স্বীকার করেছে। সে কার জন্যে? এইঅবাধ্য বেয়াদব, মেয়ের জন্যে। সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারছি না।'

মালতী বলল, 'আমার জন্যেই যদি তোমার এত অপমান, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছেদ। তোমার এ বাড়িতে আমি এক মুহূর্ত থাকব না।'

বিন্দি বাড়িউলি বলল, 'কোথায় যাবি রে, ছুড়ি? ভাতারের দুয়োর তো বন্ধ, এখন মায়ের ঘর ছাড়লে রাস্তায় আস্তানা নিতে হবে যে।'

'সেও ভাল তবু তোমার নরককুণ্ডে এক দণ্ডও নয়।' মালতী দৃপ্তপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিন্ধ্যবাসিনী চিৎকার করতে লাগল, 'অত তেজ দেখাসনি লো। কালই উকিলবাবুকে ডেকে উইল করে দেব। একটা ফুটো পয়সা পর্যন্ত পাবিনে।'

মালতী জবাব না দিয়ে হনহন করে বাড়ির বাইরে চলে এল।

চলে তো এল, কিন্তু যায় কোথায়? অঙ্গে বিধবার সাজ, একটি পয়সা নেই, কোথায় গিয়ে সে ওঠে? চেনা পরিচয় তো অনেকের সঙ্গে আছে, কিন্তু সমস্ত মানসম্ভ্রম খুইয়ে সে দীন-দুঃখীর মত কার বাড়িতে আশ্রয় নেয়?

একটা রোয়াকে বসে পড়ল সে। সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, আঁচল চাপা দিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। দু-চারজন পথচারীও জমা হয়ে গেল। কৌতূহলী দর্শকেরা ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'মেয়েটা কাঁদছে কেন গো?' একজন বুড়ী বলল, 'আহা বাছারে, এই কাঁচা বয়সে শাখা সিঁদুর ঘুচল' কাঁদবেই তো।'

কে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাঁদছ কেন বাছা? কি হয়েছে?'

মালতী চোখ মুছল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমার কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।'

সে হঠাৎ হন হন করে ওখান থেকে চলে গেল।

সহসা মনে হল সে প্রসাদ পালের ধোবিখানায় যাবে। বিপদ আপদে প্রসাদদা তাকে অনেকবার সাহায্য করেছে। এই সময়েও তার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার।

দ্রুতপদে সে প্রসাদ পালের ড্রাইংক্লিনিং শপের দিকে চলতে আরম্ভ করল।

শিরিষ গুছাইত লেনের মুখটায় প্রসাদ পালের গ্রেট ইষ্টার্ণ ড্রাইংক্লিনিং কোম্পানী। ছোট্ট একটা দোকান কিন্তু সাইনবোর্ডটা বড়। দু'খানা দরজা। কাঁচের শো কেস, কাউণ্টার আর আলমারিতে দোকানটা ঝকঝক করে। কাচা কাপড় ওখানেই থাকে। পিছনে একটা খুব ছোট ঘর। সেখানে ময়লা কাপড় জমা হয়। ধোপারা এসে ওখানে থেকে কাপড় নিয়ে যায়। প্রসাদের চেলারা প্রয়োজন মত ঐখানেই বসে, শলাপরামর্শ করে। একটা কমবয়সী ছোকরা—নাম ছকু—প্রসাদের একমাত্র সহকর্মী। সে কাপড়চোপড় সাজায় গোছায়। প্রসাদ নিজের হাতেই বাকী সব কাজ করে, মায় লেখালেখি হিসেবপত্র পর্যন্ত। দোকান ছোট হলেও প্রসাদের কারবার ভালোই চলত। ছবি বাড়িউলির ছেলে প্রসাদের দোকানটির অনেক পৃষ্ঠপোষক ছিল ঐ নিষিদ্ধ পল্লীতে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। গলির আলোগুলি জ্বলতে শুরু করেছে। তৃপ্তি কাফের সামনে খদ্দেরের জটলা। গলিটাও বেশ সরগরম হয়ে

উঠেছে সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত্রি অবধি পল্লীর গলিগুলি জমে থাকে। পথে জঞ্জালের পাহাড়। এদিকে ওদিকে মেয়েরা খদ্দের ধরার জন্যে সেজেগুজে দাঁড়িয়েছে। শাড়ী সালোয়ার কামিজ ঘাগরা তাদের পরনে, যৌবনপুষ্ট দেহগুলি বিভ্রম জাগাবার পক্ষে পর্যাপ্ত। যারা সরু লিকলিকে, তারাও সাজ-পোশাকে, প্রসাধন-বৈচিত্র্যে চটক দেখাবার চেষ্টা করেছে। ইতিমধ্যে কিছু বাবু ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। সব বয়সের সমর্থ লোকই আসা-যাওয়া করে। একটা বুড়ো ভদ্রলোক ( ? ) তো গায়ের ওপর এসে কুপ্রস্তাব করল। মালতী ভ্রূক্ষেপ না করে দ্রুত পা চালিয়ে প্রসাদের ধোবিখানার দিকে এগিয়ে গেল।

নিওনের নীল আলোয় দোকান জলজল করছিল। সেখানে কোনও খরিদ্দার ছিল না। প্রসাদ হিসাবের খাতা নিয়ে বসেছিল। ছকু পিছনের ময়লা কাপড় নাড়তে ব্যস্ত।

মালতীকে বিধবার বেশে দেখে প্রসাদ অবাক হয়ে গেল। 'ব্যাপার কি ?' প্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার এই সাজ ?'

'সব বলছি,' মালতী বলল, তারপর ছকুর দিকে ইঙ্গিত করে যেন বলল, 'ওর সামনে বলতে চাই না।'

প্রসাদ বলল, 'গরম চা খাবে ?'

'শুধু চা নয়,' মালতী বলল, 'খাওয়াবেই যদি তো পেটভরে কিছু খাওয়াও, প্রসাদদা, দুপুর থেকে আজ পেটে কিছু পড়েনি।'

প্রসাদ হাঁক মারল, 'ছকু' চট করে তৃপ্তি কাফে থেকে দু কাপ চা, আর দুটো মটন কাটলেট নিয়ে আসবি। ম্যানেজারকে বলবি যেন ভালো মাল দেয়, পেসাদদা বলেছে। হাঁ, মিষ্টি খাবে, মালতী ? এই ছকু, সুভদ্রা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে দুটো রাজভোগ আনিস। নে দশ টাকার নোট। ঠিক হিসেব করে আনবি।'

ছকু উৎসাহের সঙ্গে প্রস্থান করল।

'ভালোই হল। আজ আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল।'

'হল কি বল না,' প্রসাদ বলল, 'অত ভূমিকা কেন ?'

মালতী সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

প্রসাদ শুনে চিন্তিত হয়ে বলল, 'তাই তো, খুবই ঝামেলা গেছে তোমার ওপর দিয়ে। এখন করবে কি ? যাবে কোথায় ?'

'সেই কথাই তো ভাবছি' মালতী বলল।

'দু-চার দিন গেলে নিশ্চয়ই মাসীমার রাগ পড়ে যাবে। কিন্তু এই দু-চার দিন থাকবে কোথায়? মায়ের বাড়িতে একটা ঘর কিছুদিন খালি পড়ে আছে। ভাড়াটে নেই। সেখানে কদিন থাকতে পারে। অবশ্য পাশের ঘরগুলোয় মেয়েরা থাকে।'

'না না, আমি কারুর বাড়িতে থাকতে চাই না।' মালতী বলল, 'কোনও একটা হোটেলে যদি থাকতে পারতুম। কিন্তু সে তো অনেক খরচ।'

'সে না হয় আমার কাছ থেকে ধার নিতে। কিন্তু এই রাত্রে এখন সুবিধামত হোটেল বা পাওয়া যায় কোথা? এক কাজ করি, তোমার খাওয়া হলে, দোকান বন্ধ করে দি, তোমায় নিয়ে শ্যালদার কাছে কোনও যাত্রী-নিবাসে জায়গা খুঁজে বার করি।' প্রসাদ প্রস্তাব করল।

মালতী বলল, 'কেন অত ঝামেলা পোয়াবে? আজকের রাতটা আমি তোমার এই দোকানের পিছনের ঘরটায় থাকি, তোমার অসুবিধে হবে কি?'

'আমার অসুবিধে আর কি?' প্রসাদ বলল, 'ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে তুমি টিকতে পরলে হয়।'

'দোকান বন্ধ হলে এই লম্বা টেবিলের ওপরও আমি অক্লেশে শুতে পারি,' মালতী বলল 'আর বাড়িওলার কলঘর পায়খানা তো দোকানের পিছনেই আছে।'

'এ তুমি পারবেনা,' প্রসাদ বলল, 'তোমার নিশ্চয় কষ্ট ববে।'

'একটা রাত তো,' 'মালতী বলল,' 'মনে করব যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটাচ্ছি।'

'তুমি যদি পার তো আমার আপত্তি নেই। সকাল দশটার আগে তো দোকান খুলি না। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'

'যাক' আজকের রাতটার জন্যে তো বাঁচা গেল, মালতী আশ্বস্ত হয়ে বলল।

ছকু খাবার নিয়ে এল। মালতী বলল, 'এত খাবার আমি একা খাব কি করে? তুমিও খাও, প্রসাদদা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এক কাপ চা খাচ্ছি না হয়।'

'তা হয় না, তুমি নাও। আর আমি রাজভোগ খাব না। ছকু ও দুটো নিক, ও অনেক খাটল, কি বল?'

'না ঝুনুদি,' ছকু লজ্জায় সঙ্গে বলল, 'আমি ওসব খাইনে।'

'ছকু,' প্রসাদ বলল, 'দেখে আয় তো পিছনের কলঘরটা খালি আছে কি না? থাকলে চৌবাচ্চা থেকে এক বালতি জল তুলে ঘরটায় দে। আর চট করে অজিতের মণিহারি দোকান থেকে একটা ভাল গায়ে মাথার সাবান আনিস। তোর ঝুনুদি হাতমুখ ধোবে।'

ছকু হুকুম তামিল করতে ছুটল।

'তোমার এই বেশ এখনই ছাড়তে হবে, ঝুনু,' প্রসাদ বলল, 'এ আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'কিন্তু আমি জামাকাপড় পাই কোথা?' মালতী বিব্রত হয়ে বলল, 'আমি তো একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছি।'

'ধোবার বাড়ি আবার জামাকাপড়ের অভাব?' প্রসাদ বলল। সে একটা প্যাকেটের দড়ি খুলে সদ্য কাচা ইস্ত্রিকরা পরিষ্কার আটপৌরে নীল শাড়ি, সায়া বডিস আর ব্লাউজ দিল। একটা কাচা তোয়ালেও দিল। মালতী ইতস্তত: করছিল।

প্রসাদ বলল, 'তোমায় নোংরা কোন জিনিস দিতে পারি কি? এ আমার দিদির জামাকাপড়। আমার এখানে কাচতে দিয়েছিল। দুচারদিন বাদেও ফেরৎ দেওয়া যাবে। এগুলো তোমায় ফিট করবে। গা ধুয়ে এসে তৃপ্তি করে খাও। বেশি দেরি কর না, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ছকু সাবান নিয়ে এল। মালতী আর দ্বিধা না করে পিছনের কলের ঘরে ঢুকল।

শুধু গা ধোওয়া নয়, শীতের রাত্রে হলেও ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে বেশ আরাম লাগল মালতীর। সে চটপট স্নান সেরে চুল এলো করে দোকান ঘরে ফিরে এল। প্রসাদ একজন খরিদ্দারকে তার কাচা কাপড় ফেরৎ দিচ্ছিল। পয়সাটা ক্যাশ বাক্সে রেখে বলল, 'লোকগুলোর সময়-অসময় নেই, যখন-তখন এসে বিরক্ত করে।'

লোকটা চলে যেতে মালতী কাউন্টারের পিছনে গেল। প্রসাদ বলল, 'ছাড়া কাপড়গুলো ওধারে রাখ। আমি কালই আর্জেন্ট কাচিয়ে দেব।'

মালতী প্রসাদের চেয়ারে বসে খেতে লাগল। প্রসাদ কাউন্টারের ওপরেই বসল রাস্তার দিকে পিছন ফিরে। দুজনে খাবার ভাগাভাগি করে খেল। খাবার সময় বিশেষ কোন কথা বলল না ওরা।

গলির মধ্যে দিয়ে পুলিসের একটা গাড়ি পাড়া কাঁপিয়ে চলে গেল। তার

কর্কশ হর্নে সরু গলি গমগম করল। শিকারী মেয়েরা আওয়াজ শুনে চটপট যে যার বাড়িতে লুকিয়ে পড়ল। একটি মেয়ে বুঝি পারল না। একজন সেপাই সুট করে নেমে তাকে চট করে গাড়িতে তুলল। মেয়েটা অশ্রাব্য গালিগালাজ দিল। আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল। কিন্তু সেই বলিষ্ঠ দেহের সঙ্গে পারল না। এসব নিত্যকারের ব্যাপার। রোজই কিছু ধরপাকড় হয়। শান্তিরক্ষকদের নইলে মান থাকে না। থানায় হিসেব নিকেশে ঘাটতি পড়ে, উপরি আয়ও বন্ধ হয়ে যায়। উপযুক্ত দক্ষিণা আর ফাইন দিয়ে বাড়িওয়ালীরা ভাড়াটিয়াদের খালাস করে আনে। ওটা ব্যবসার অঙ্গ।

পুলিসের গাড়ি চলে যেতেই একদল ছেলে জটলা করে এল প্রসাদের দোকানে। এরা পল্লীর যুবকবাহিনী। প্রসাদের অনুরক্ত। ভোম্বা, যেদো, ঝণ্টা, ঘণ্টে, হিটলার আরও অনেকে। তারা হই হই করে অভিযোগ করল, পুলিস জুলুম বেড়েই চলেছে। এবারে দু'চারটে পানতুয়া না ঝাড়লে শালারা ঠাণ্ডা হবে না। পানতুয়া অর্থাৎ বোম। পুলিস যখন-তখন কেবল মেয়েদের ধরছে তা নয়, ভদ্দর-লোকেদেরও হ্যারাস করছে। একটু কড়কে না দিলে হুজ্জুত বেড়েই যাবে।

প্রসাদ বলল, 'পানতুয়ার কথা ছাড়ান দে। শেষে ধরা পড়লে লম্বা মেয়াদ হয়ে যাবে। সেবার তো বোম বাঁধতে গিয়ে মণ্টের হাতটাই উড়ে গেল। কি ঝামেলা করে তাকে বাঁচাতে হল! ওর চেয়ে সহজ রাস্তা হল, কয়েক হাঁড়ি সরেস আসল পানতুয়া কত্তাদের ভেট দেওয়া। এর জন্যে চাঁদা তুলতে হবে।'

হিটলার বলল, 'এতেও যদি হুজ্জুত না থামে পেসাদদা, দমাদম আধলা ঝাড়ব। তাতে আর হাত উড়বে না। আর লম্বা মেয়াদও হবে না। বড় জোর থানায় পেটন, ইলেকট্রিক শক আর ক'দিনের কয়েদ।'

প্রসাদ কথাটা ঘোরাবার জন্যে বলল, জানিস, 'তোদের ঝুমুদি আজ রাত্রে এই দোকানে থাকবে!'

ভোম্বা বলল, 'কেন টিকটিকির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে না কি?'

'দূর হাঁদা,' প্রসাদ বলল, 'তোর ঝুমুদি কি বোম-পটকা ঝাড়ে, না ছিনতাই করে? ও ভাল মেয়ে।'

'সে তো জানি', ভোম্বা বলল, 'তাই তো বুঝতে পারছি না।'

প্রসাদ বলল, 'ওর মার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

ভোম্বা বলল, 'বয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকুক।

প্রসাদ বলল, 'সে দরজাও বন্ধ। আজকের মামলায় ওর বিয়ে বাতিল হয়ে গেছে।'

হিটলার বলল, 'তাই মাথায় সিঁদুর দেখছি না, হাতে শাঁখা নেই। ঝুনুদি, একবার হুকুম কর, আমরা তোমার শ্বশুরবাড়ির দরজা ভেঙ্গে ফেলি। মামলাটামলা মানি না, শুধু একবার বল আমরা এখনি বোনাই শালাকে চ্যাংদোলা করে ধরে এনে তোমার পায়ে ফেলি।'

মালতী এতো দুঃখেও হেসে ফেলল। বলল, 'আর বীরত্বে কাজ নেই। হ্যাঁরে হিটলার, সেবার ক্লাবের কেশব দত্ত বাবুকে কে রড মেরেছিল রে?'

'বলব?' হিটলার মাথা চুলকতে লাগল।

'আমায় বলবি না?' মালতী বলল, 'আমি তোদের দিদি হই।'

হিটলার বলল, 'নেপোলিয়ান।'

'নেপোলিয়ান!' ঝুনু অবাক হয়ে বলল। 'নেপোলিয়ন তো অনেককাল মরেছে।'

'ধেৎ, সে তো যাত্রার নেপোলিয়ান', হিটলার বলল, 'এ আমাদের নেপো—নিরপেন্দর। আমরা ওকে নেপোলিয়ন বলি। তুমি যখন পেসাদদাকে বললে কেলাবের ঐ কাপ্তেনবাবু থিয়েটারে তোমার ওপর বলাৎকার করতে গিয়েছিল, আমরা শুনতে পেয়েই আমাদের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। ঝুনুদির অপমান। কাপ্তেনই হোক আর যেই হোক, কুত্তার বাচ্চাকে শায়েস্তা করতেই হবে। আমরা ঠিক করলুম, আচ্ছা পেদানি দিয়ে দেব। তক্কে তক্কে রইলুম। আপিসের সন্ধান নিলুম। পেছন পেছন ফলো করলুম। একটু একা পেয়েছি, ব্যস। শালা নেপোলিয়ান রগচটা, ধাঁই করে মাথায় রড্ চালিয়ে দিল। লোকটা হাত দিয়ে সামলে ফেলল। নইলে মাথা ফট্টাস, ইন্ ওয়ান সেকেণ্ড যমের বাড়ি।'

'লোকটাকে মেরে ঠিক করিসনি ভাই,' মালতী বলল।

হিটলার বলল, 'তুমি রাগ করছ ঝুনুদি। বেশ আমরা প্রাচিত্তির করছি। একবার বল ওই বোনাই শালাকে চ্যাং-দোলা করে তোমার পায়ে ফেলি। শালা যতক্ষণ না পায়ে ধরে সেধে তোমায় ঘরে নিয়ে যায় তার ছাড়ান ছোড়ন নেই।'

'থাক ভাই,' মালতী ম্লান হেসে বলল।

'তোরা ভাই আর ঝঞ্ঝাট বাড়াসনি।' প্রসাদ বলল, 'যা, যে যার ঘরে

ফিরে যা। আবার হল্লা গাড়ি যদি তোদের কাউকে ধরে আবার আমায় থানায় ছুটতে হবে জামিন হবার জন্যে।'

'এরি মধ্যে বাড়ি ফিরব?' ঝণ্টা বলল, 'মা ভাববে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল, নিশ্চয় বেচারার জরজ্বাড়ি হয়েছে, অমনি তেঁতো ওষুধ গিলিয়ে দেবে।' ওরা হো হো করে হেসে উঠল।

ঘেদো বলল, 'চ, চ, আমরা ভোস্তাদের রকে বসে খানিক গুলতানি করি।'

হিটলার বলল, 'যাচ্ছি বটে কিন্তু আজ সারারাত এই ধোবিখানায় পালা করে আমরা পাহারা দেব। ঝুনুদি থাকবে। কোনও বোনাইবাবু যদি এ ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারে তো শালার মাথা চৌচির করে দেব।'

শুধু সে রাত্রি নয়। বেশ কটা রাত্রি মালতী একা একা সেই ধোবিখানায় কাটাল। দিনের বেলায় বেশির ভাগ সময় সে পথে পার্কে ঘুরত, রাত্রি হলে ঐ দোকানে আশ্রয় নিত। মাঝে মাঝে প্রসাদের হিসেবের খাতা লিখে দিত। ছেলের দল এসে নানা হাসি মস্করায় জমিয়ে দিত। তাদের কেউ কেউ রাত্রে ঝুনুদিকে পাহারা দিত। গলায় হাঁক মেরে বন্ধ দরজার ওপার থেকে জানান দিত, তারা আছে।

একদিন প্রসাদ বলল, 'জান ঝুনু, নরেশ উকিল বলছিল, একতরফা মামলার নিষ্পত্তি হলে সেটাকে কাঁচিয়ে দেওয়া যায়। এখনও নাকি সময় আছে, ছানি করলে মামলা নতুন করে শোনানি হতে পারে। অবশ্য দরখাস্ত করতে হবে। টাকা খরচা করতে হবে।'

মালতী শান্তভাবে বলল, 'যা চুকেবুকে গেছে, কেন আবার কেঁচে গণ্ডুষ করা? আমি আর মামলা লড়ব না, প্রসাদদা।'

প্রসাদ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কাল ভোরে নকুল-বাবুর সঙ্গে পথে দেখা। পাঁচ নম্বর বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিল, চোখগুলো লাল, ফোলা। মনে হল সারা রাত বেলেল্লাপনা করেছে।'

মালতী বলল, 'ওসব কথা থাক, পরচর্চায় আমার লাভ নেই।'

প্রসাদ বলল, 'শোন না শেষ অবধি। চটছ কেন? আমি তোমায় না জিজ্ঞেস করেই তাকে বললুম, 'নকুলবাবু এসব কি হচ্ছে? ঝুনুর মত একটা মেয়ে, তাকে তোমরা কিনা ত্যাগ করলে? বিয়েটাকে শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দিলে?' সে বলল, 'বাতিল হয়েছে তা কি হয়েছে? আবার বিয়ে হতে পারে।' আমি বললুম, 'ঝুনু সহদেবকে এখনও ভালবাসে।' নকুল

বলল, 'কেন, সহদেবের সঙ্গে আবার বিয়ে হতে পারে।' আমি বললুম, 'সে কি?' নকুল বলল, 'একবার আমি বিয়ে দিয়েছিলুম। আবার দিতে পারি যদি আমার ইচ্ছে হয়।' আমি বললুম, 'কি করে?' সে বলল, 'বিন্দি ঠাকুরুন যদি তার একটা বাড়ি আমায় লিখে দেয় তো আমি আবার ঘটকালি করি।'

প্রসাদ বলল, 'আমি রাগের মাথায় নকুল শালাকে যা তা গালিগালাজ করলুম। তবু নকুলের কথাটা ভেবে দেখবার মত।'

'আবার ঐ লোকটাকে বিশ্বাস করব?' মালতী বলল।

প্রসাদ বলল, 'তা যা বলেছ।'

রবিবার প্রসাদের দোকান বন্ধ। প্রসাদ কি এক কাজে কলকাতার বাইরে গেল। দোকানের দরজা ভেজিয়ে সারাদিন মালতী ওখানেই কাটিয়ে দিল।

সন্ধ্যের দিকে প্রসাদ ফিরল বেশ শ্রান্ত হয়ে। সে হতাশ হয়ে মালতীকে বলল, 'নাঃ, হল না।'

মালতী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল না, প্রসাদদা?'

'লোকটা কিছুতেই রাজী হল না।'

'কে লোকটা? কি ব্যাপারে রাজী হল না?'

প্রসাদ বলল, 'নকুলবাবুর কথা আমি ফেলতে পারলুম না। একটু যাচাই করে দেখতে চাইলুম। তাই তোমায় না বলে আমি নিজে বাসে করে মুরলাগ্রামে গেলুম।'

'তার সঙ্গে দেখা হল?' মালতী চাপা আগ্রহে বলল, 'কেমন আছে সে?'

'ভালই আছে।' প্রসাদ বলল, 'তোমার কথা তুলতেই এড়িয়ে গেল। আই আর্ এইট্ ধান ফলিয়ে প্রাইজ পেয়েছে। স্কুলটা দশ ক্লাস অবধি অনুমোদন পেয়েছে—এইসব বকবক করে গেল। আমি যখন শেষ অবধি চেপে ধরলুম, বললুম, তুমি ঝুনুকে আবার বিয়ে কর।' সে বলল, 'দাদা, যে হাঁড়ি ভেঙ্গেছে, যতই পলস্তরা লাগাও, তাতে আর জোড়া লাগবে না।'

'তুমি আমার জন্যে কেন অপমান হতে গেলে, প্রসাদদা?' মালতী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল।

'এতে আর মান-অপমান কি আছে?' প্রসাদ বলল, 'সহদেব কিন্তু আসচে হপ্তায় একটা লরি ভাড়া করে যৌতুকের সমস্ত আসবাবপত্র, মায় সাইকেলটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। যৌতুকের নগদ টাকা প্রায় খরচা হয়ে গেছে। সে খানিকটা জমি বেচে সে টাকাও তোমার মাকে ফেরৎ দেবে।'

'সে কোন ঋণই রাখবে না আমাদের কাছে?' মালতী ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলল।

প্রসাদ চুপ করে রইল।

কদিন বাদে হারু মিত্তির স্বয়ং হাজির। ইনিয়ে বিনিয়ে সে মালতীকে বলল, 'ঝুনুমা, এটা কি ভাল হচ্ছে? তোমার মত একটি মেয়ে একটা ধোবিখানায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছে?'

'কেন? আমি তো বেশ আছি,' মালতী বলল।

হারু বলল, 'তা কি হয়? একটা ধোবিখানায় এমন সুখের শরীর কি বেশ থাকতে পারে? তুমি ফিরে চল, মা। আমি যে লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারছি না।'

মালতী বলল, 'এ তো বেশ মজা হল! উনি বললেন, আমি তোমার জন্যে সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। মাও বললে, তোর জন্যে সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। আর তুমিও বলছ এই একই কথা। আমি তবে কি করি?'

হারু বলল, 'সহদেবটা তোমায় ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু আমি ত্যাগ করি কি বয়ে? যদিও তোমার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, তবু একটা বন্ধন আছে তো। তোমার মার আমি—ইয়ে—। আমার পদবী তোমার নামের পিছনে। আদালতের নথিতেও সেই পরিচয় আছে। লোকে আমাকেই কথা শোনায়, তোমার মায়ের আর কি? গোঁসা করে দোর বন্ধ করে পড়ে থাকলেই হল। কিন্তু আমাকে তো লোকসমাজে বেরুতে হয়। লোকে বলছে, হারু মিত্তির মেয়েটার অনাদর করছে। তোমায় আজই ঘরে ফিরে যেতে হবে, মা। উনিও রাজি হয়েছেন।'

মালতী বলল, 'আগে পেসাদদা আসুক।'

হারু বলল, 'সে ছোঁড়া আবার কি বলবে? সে তোমার গার্জেন নাকি? ওর জন্যে আবার আমার বসে থাকতে হবে? তোমার মা বলেছেন, আজই তোমায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে নেতে হবে। সেদিন ব্রাণ্ডির নেশায় উনি যা তা বলেছিলেন। আমি থাকলে এসব কেলেঙ্কারি কিছুতেই হতে দিতুম না।'

ছকুকে বলে মালতী হারু মিত্তিরের সঙ্গে বাড়ি ফিরল। বিন্ধ্যবাসিনী ভাঙে তবু মচকায় না। অবাধ্য মেয়েকে সে কখনও পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারে নি। যদিও সে কোনও গালমন্দ করল না, মেয়ে ফিরে এলে সে তাকে

ফুটে. মিষ্টি কথাও বলল না। মা ও মেয়ের মধ্যে অভিমানের দুস্তর পাহাড়। কথাবার্তাও নিতান্ত প্রয়োজনে, নিতান্ত হৃদয়সম্পর্কশূন্য।

তবু নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে এসে মালতী যেন স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে জানে সময়ে মায়ের রাগ পড়ে যাবে।

আর গেলও যেদিন একটা লরি করে নকুল যৌতুকের আসবাবপত্র, মায় সাইকেল পর্যন্ত ফেরত দিল, পাড়ার লোক চেয়ে দেখল সে সব। একদিন ফুলশয্যার তত্ত্ব লরি করে মুরলাগ্রামে গেছল, সেদিনও লোকে চেয়ে দেখেছিল নিশ্চয়। আজও দেখছে। কিন্তু দুই দেখার মধ্যে কত পার্থক্য! তবু মালতীর গর্ব হল। সহদেব জোচ্চোর নয়। নকুল কিছুদিন সময় চাইল, বলল, 'সহদেব যৌতুকের টাকাটাও জমি বেচে ফেরত দেবে।'

বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। সে এবার মালতীকে জড়িয়ে ধরল, কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুই কিছু মনে করিস নে, মা। সেদিন রাগের মাথায় তোকে যা তা বলেছি সেদিন আমার জ্ঞানগম্যি ছিল না। এজন্যে আমি মেনকা মাগীকে খুব মেরেছি। সে মাগী কেন আমার কথা শুনে তোকে এমন হেনস্তা করল?'

মালতীও মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী চোখ মুছে বলল, 'এসব কাঠকাঠরা আসবাবপত্তর তোরই। যেটা পছন্দ রাখিস, ইচ্ছে হলে বেচে দিস।'

মালতী বলল, 'সে হবেখন। দুদিন বাদে এসব ভেবেচিন্তে করা যাবে।'

নীচের দালানটায় সাময়িকভাবে জিনিসপত্রগুলো জড়ো করে রাখা হল। আলমারির মধ্যে মালতীর সব জামা-কাপড়, গহনাগাঁটি মজুদ ছিল। সহদেব নিজের হাতে লিস্ট করে দিয়েছে। নিজের দাদাকে সে বিশ্বাস করেনি, বলেছে, মালতীর একটা সই করিয়ে আনতে হবে প্রাপ্তিস্বীকারের প্রমাণস্বরূপ। বিন্ধ্যবাসিনী নিজে সব লিস্ট মিলিয়ে নিয়েছে। সব ঠিক আছে। সে শুধু বলল, 'জামাই নিজের জামাকাপড় সব রেখে দিয়েছে। অবশ্য ঘড়ি-আংটি ফেরত দিয়েছে।' মালতী মনে মনে ভাবল, মার এমন ছোট নজর কেন? সব সময় কড়াক্রান্তির হিসেব। মালতী সহদেবের হাতের লেখাটা ফেরত দিল না। তার একটা কপি করল নিজের হাতে; সেটাতে সই করে নকুলের হাতে ফেরত দিল

নকুল চলে যেতে মালতী মাকে বলল, 'একটা কথা বলব, রাগ করবে না বল।'

'কি কথা রে?' বিন্ধ্যবাসিনী খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'ভাবছি, সাইকেলটা প্রসাদদাকে দিয়ে দিলে কেমন হয়?' মালতী বলল।

বিন্ধ্যবাসিনী মুখটা একটু ব্যাজার করে বলল, 'সে যেমন দেমাকী ছেলে, নিলে হয়।'

'আচ্ছা, আমি একবার বলে দেখি না।' মালতী বলল।

মায়ের সঙ্গে আপোষরফা হলেও মালতীর শান্তি নেই। এবার অশান্তির সূত্রপাত ঘটাল হারু মিত্তির।

মালতী প্রাইভেটে স্কুল-ফাইনাল দেবে মনে করে বইটাই কিনে আবার লেখাপড়ায় মন দিল। স্কুলের পুরানো বান্ধবী কাবেরী কত আগেই বি-এ পড়ছে, পার্ট ওয়ান পাশ করেছে। মালতী নিয়মিত পড়লে অতদূর এগিয়ে যেত। মালতী তার সঙ্গে যোগাযোগ করে পড়ার ধাঁচটা বুঝে নিচ্ছে। নিজে নিজে একটু এগোলে প্রাইভেট টিউটার রাখার ইচ্ছা আছে তার।

কিন্তু বিপদ এল হারু মিত্তিরের কাছ থেকে। হারু মিত্তির চায় না, মালতী বাড়ি বসে বসে শুধু পড়াশোনা করে। সে গাইতে পারে, নাচতে পারে, অভিনয় করতে পারে। এইসব গুণগুলি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। এ উচিত নয়। মালতী ফাংশনে যাবে, নাচবে, গাইবে, একটিং করবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসারে কিছু সাশ্রয় হবে, এই হল হারু মিত্তিরের প্রস্তাব।

প্রস্তাবটা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসহ। বেণীদা গেছলেন, ক্লাবে নতুন একটা বই ধরা হয়েছিল, মালতীকে হিরোইনের পার্ট দিতে চান। মেরেকেটে দুশো টাকা আর গাড়িভাড়া দক্ষিণা দেওয়া যাবে। মালতী রাজী হয়নি। বেণীদা নগদ তিনশো টাকা অবধি উঠেছিলেন। কিন্তু মালতী সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল। আরও অনেক ক্লাব মার্চেণ্ট অফিস সংস্থা প্রভৃতি কদিন ধরে তাদের প্রতিনিধি পাঠাল মালতীর জন্যে। মালতী কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করল না। হারু মিত্তির হিসেব করে দেখল, এক মাসে মালতী প্রায় তেরশো টাকার মত কণ্ট্রাক্ট হারাল। হারু মিত্তির খুব গজগজ করতে লাগল। এমনকি সে বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে নালিশ করল, কিন্তু সেদিকে কোনও সমর্থন পেল না। হারু মিত্তির কদিন একটু চুপচাপ রইল।

সে অবার একদিন প্রস্তাব আনল, কেতকী প্রোডাক্সন্‌স্‌ বলে একটা নতুন ফিলম্‌ কোম্পানী হয়েছে, তারা নাকি তারাশঙ্করের একটা উপন্যাস থেকে ফিল্‌ম্‌ তুলবে। একটা সাইড পার্টে মালতী ট্রায়াল দিতে পারে। পছন্দ হলে তারা মালতীকে ভাল টাকা দেবে। মালতী বেশ একটু প্রলুব্ধ হয়েছিল। বলেছিল, 'তুদিন ভেবে জানাব।' কিন্তু শেষ অবধি সে এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু হারু মিত্তির সর্বশেষে যে প্রস্তাব আনল, তা শুনে মালতী স্তম্ভিত হয়ে গেল। শ্রীবাস্তব বলে এক উঠতি ব্যবসায়ী নতুন কারবার খুলেছে। পার্ক স্ট্রীটে তার অফিস, সাজানো-গোছানো। ফরেন এক্সপোর্টের কাজ। অনেক বড় বড় আদমি তার সঙ্গে কারবার করে। হারু মিত্তিরের সঙ্গে তার পরিচয় কিছুদিন জমেছে। শ্রীবাস্তব একটি গুণবতী রিসেপ্‌সনিস্ট খুঁজছিল। মিত্তিরবাবুর মেয়ের কথা শুনে সে প্রায় রাজী। মালতীর ছবি দেখে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তাকে চাকুরীতে বহাল করতে। কাজ হালকা কিন্তু মাইনে অনেক, সাড়ে চারশো থেকে শুরু, এলাউয়েন্স আছে, কুড়িয়েবাড়িয়ে প্রথম থেকে ছশো সাড়ে ছশো টাকা মাসে ঘরে আসবে। প্রস্তাব শুনে মালতী খুব উল্লসিত হয়েছিল। বিন্ধ্যবাসিনীও রাজী হল। প্রসাদকে কথাটা বলতেই সে বলল, 'হারু মিত্তির ঘড়েল লোক, আগে আমি খোঁজ নি। তারপর হাঁ না বল।'

প্রসাদ একদিনের মধ্যেই যা খবর আনল তা ভয়ানক। শ্রীবাস্তব লোকটা শয়তান। কারবারের নাম করে সে কল্‌ গার্ল-এর দালালি করে। অফিসটা তার নামে মাত্র। রিসেপশনের ঘরে সোফা-কাম-বেড রেখেছে। অফিস্‌ রুমেও দেওয়ালে ঢোকানো ফোম্‌ রবারের বেড। এখানে অনেক আধুনিকার সমাগম হয়। নামকরা লোক অনেকেই ওখানে যায়, যারা সম্মানের খাতিরে নিষিদ্ধ পল্লীতে আসতে পারে না। সেখানেই মালতীর কাজের প্রস্তাব এনেছে হারু মিত্তির।

মালতী রাগ করল হারুমিত্তিরের উপর। রাগের মাথায় অনেক তিরস্কার করল তাকে। হারু মিত্তির ছাড়েনি, বলল 'বসে বসে গিলে গিলে তো কেঁদো বাঘ হচ্ছ। যৌবন আর কতদিন থাকবে? এই বয়সে যদি কিছু না কামাবে, তো কামাবে কবে?'

'বাবা বলেই তোমার পরিচয়,' মালতী রেগে বলল, 'এই কুপ্রস্তাব দিতে

দিতে তোমার লজ্জা করছে না ?'

'ওরে আমার সতী সাধ্বীর মেয়ে সীতে দময়ন্তী রে!' হারু মিস্তির বিদ্রূপ করল, বলল, 'আজকাল কত আসল বাপ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মেয়েকে খাটিয়ে লাভারের কাছে পয়সা মারছে। আমি তো পাতানো বাপ!'

মালতী ক্রোধ দমন করতে পারেনি। সে হারু মিস্তিরের গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল।

'তুমি আমায় মারলে ? তুমি আমায় মারলে ?' হারু মিস্তির মাথা নীচু করে চলে গেল।

এসব কথা কোনও পক্ষই বিন্ধ্যবাসিনীকে জানাল না। মালতী শুধু বলল, 'ওখানে চাকরি করব না।'

মালতী কদিন ধরে মাস্টারের সন্ধান করছিল। সে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলও। কিন্তু সুবিধামত মাস্টার পাচ্ছিল না। এ ব্যাপারে প্রসাদও বিশেষ সাহায্য করতে পারল না।

হারু মিস্তির একদিন বলল, 'একটি ছেলে আছে, বি-এ পাশ, আগে মাস্টারী করেছে। এখন মার্চেন্ট অপিসে ভাল কাজ করে। আবার যাত্রা থিয়েটারেও ঝোঁক আছে। মালতী রাজী হলে সে রোজ এসে পড়াতে পারে।'

হারু মিস্তিরের কোনও প্রস্তাবই মালতী কাণে তুলতে চায় না আজকাল। বিন্ধ্যবাসিনী তবু বলল, 'একবার মাস্টারকে পরীক্ষে করে দেখতে দোষ কি ?'

যেদিন সন্ধ্যায় নতুন মাস্টারের আসার কথা, সেদিন মালতী আগে থাকতে তার ঘরে পড়ার টেবিলে বইটইগুলি গুছিয়ে রাখল। টেবিলে নিজের হাতের কাজ করা একটা টেবিলক্লথও চাপা দিল। নিজে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও হয়ে রইল।

হারু মিস্তির মাস্টারকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকল। নবাগতকে দেখে মালতী স্প্রিং-এর পুতুলের মত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'একি, কেশববাবু, আপনি এখানে ?'

কেশব বলল, 'কেন ? তুমি জানতে না আমি আসব ?'

'ককখনো না,' মালতী বলল, 'আমি আপনার মুখ দেখতে চাই না। যান, বেরিয়ে যান বলছি।'

'এ কি ব্যবহার, হারুবাবু!' কেশব রাগ করে বলল, 'আপনার মেয়েকে দিয়ে অপমান করাবার জন্যে আপনি আমায় ডেকে এনেছেন ?'

হারু আমতা আমতা করে বলল, 'আমি তো জানতুম না, আপনাদের মধ্যে আগে থাকতে জানাশোনা আছে। ঝুনু মা, কেশববাবু বিদ্বান লোক, ওঁর মাস্টারির কৃতিত্বটা একবার পরখ করে দেখই না।'

মালতী ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'তুমি চুপ কর তো। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। কেশববাবু, আপনি ভালোয় ভালোয় এখান থেকে বিদেয় হবেন, না আমি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব?'

কেশব নাছোড় বান্দা। সে বলল, 'মেয়েকে দিয়ে অপমান করানোর জন্যে কি আপনি আমার কাছে পাঁচশো টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন?'

'তার মানে?' মালতী বলল।

'আমার কাছে পড়ার জন্যে—মানে মাঝে মাঝে আলাপ করার জন্যে - উনি তোমাকে রাজী করাবেন, এই শর্তে উনি আমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়েছেন।' কেশব দৃঢ়কণ্ঠে বল।

'ডাহা মিথ্যে কথা। আমি তো পাঁচশো টাকা আপনার কাছে ধার নিয়েছি, সময় হলে শোধ করে দেব।' প্রতিবাদ করে বলল হারু মিত্তির।

কে যে সত্যি কথা বলছে বোঝা ভার। মালতী বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোনও কথা শুনতে চাই না, আপনি এই মুহূর্তে দূর হোন এখান থেকে।'

কেশব বেগতিক দেখে পশ্চাদপসরণ করল। মালতী চেঁচিয়ে বলল, 'আবার যদি আমায় কখনো বিরক্ত করতে আসেন তো এমন ব্যবস্থা করব যাতে বোমার ঘায়ে আপনার মাথার খুলিটা উড়ে যায়।'

এর পরই মালতী আমার কাছে আসে, আর চাকরি খুঁজে দিতে বলে। কি চাকরি করবে সে? তার এই ভরা যৌবনে যেখানে সেখানে তাকে কাজের জন্যে পাঠানো যায় না। তাছাড়া তার যা যোগ্যতা, সেটা সাধারণ চাকরির জন্যে নয়। বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভাল ভাল ছেলেদেরই কাজ হয় না, তো মালতীর মত মেয়েদের কাজ কোথায় পাব?

আমি নিজে অসামর্থ্যের জন্যে কিছুটা ব্যথিত হলুম। তবু আশ্বাস দেবার জন্যে বললুম, 'আচ্ছা, যদি তেমন কোনও ভাল কাজের খোঁজ পাই, তোমাকে জানাব।'

মালতী চলে গেল।

ঐ একবারই সে আমার কাছে এসেছিল। আর ঐ একবারের কথাবার্তায় সে নিজের মনকে উজাড় করে দিয়েছিল।

বেশ কয়েক মাস বাদে একটি বিশেষ উপলক্ষে আমি বিপিন যশ লেনে ওদের বাড়িতে যাই। মালতী কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করেনি। বলে পাঠিয়েছিল, 'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আমার লজ্জা করছে, আমি দেখা করতে পারব না।'

বেশ কয়েক মাস পরের ঘটনা। এই নিয়ে কাহিনীর উপসংহার করি।

আমি কয়েকজন বন্ধুকে মালতীর উপযুক্ত কাজের জন্যে সন্ধান দিতে বলি। কিন্তু কেউ পারল না। সেইজন্য আমিও মালতীকে কোনও খবর দিইনি। সেও আসেনি আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাছাড়া অনেক কাজের চাপে আমি মালতীর কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলুম।

হঠাৎ একদিন এল এক অপরিচিত যুবক। তার রংটা ফর্সা। গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট, মধ্যম আকৃতি। মুখটা কেমন চেনা চেনা লাগল। সে এসে নমস্কার করে বলল, 'আমায় চিনতে পারছেন? আমি প্রসাদ পাল।'

এবার মনে পড়ল মালতীর কাছে ওর নাম অনেকবার শুনেছি। ও বিপদে আপদে মালতীকে অনেক সাহায্য করেছে। ও কোন্ এক বাড়িউলির ছেলে। এতে আমার মনে বিশেষ কিছু এসে যায় না।

আমি তাকে বসতে বললুম। প্রথামত জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি ব্যাপার, ভাই?'

'আমাদের পাড়ায় একটা সার্বজনীন কালীপূজা আছে,' প্রসাদ বলল, 'এবার সেটা ঘটা করে করব ঠিক করেছি। আমাদের ইচ্ছে আপনি উদ্বোধনী সভার প্রধান অতিথি হন।'

'কবে হবে সেটা?'

'অনেকে আগেই করে', প্রসাদ বলল, 'কিন্তু আমরা পুজোর দিন সন্ধ্যেয় সভা করব। ঠিক সাড়ে ছটায়। তারপর একটা জলসা হবে প্যাণ্ডেলে। আপনি এলে আমরা খুশী হব।'

আমি ডায়েরী দেখে বললুম, 'বেশ ঐ সময়টা খালি আছে। আমি যাব।'

প্রসাদ বলল, 'আমাদের কেউ নিতে আসবে কি?'

আমি বললুম, 'তার দরকার নেই। বিপিন যশ লেন আমার জানা আছে।'

প্রসাদ বলল, 'আমি গলির মোড়ে অপেক্ষা করব। ওর কাছেই একটা পোড়ো মাঠে পুজো হবে।'

আমি নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে গেলুম। খুব ঘটা করে পূজোর আয়োজন হয়েছিল। রাস্তায় আলোর সারি। এমনভাবে আলো সাজান হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন একটা আলোর টানেল্। গেটটাও খুব দর্শনীয়। প্যাণ্ডেলটাও বিরাট। কালী প্রতিমাটি আকারে সুবৃহৎ। প্রায় দেড় মানুষ তার আয়তন। মুখটি ভাল কালীমূর্তির। দুটো রাক্ষসী দুপাশে যেন গিলে ফেলতে আসছে। খুব সুদৃশ্যভাবে সাজানো হয়েছিল প্যাণ্ডেলটি। কাপড়ের কুচি এমন কায়দা করে লাগানো হয়েছিল মনে হচ্ছিল যেন ওটা বাদশাহী দরবার কক্ষ। একটা উঁচু মঞ্চের উপর পদাধিকারীদের বসবার আয়োজন ছিল, সেই সঙ্গেই জলসার আসর। সামনে শ' তিনেক ফোল্ডিং চেয়ার।

লাউড স্পীকারে ফিল্মের গান হচ্ছিল। সে সব ছাপিয়ে দুমদাম করে পটকা আর বোম ফাটার শব্দ। সামনে একগাদা ছোট ছেলেমেয়ে কিচির-মিচির করছিল। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের ধমক দিচ্ছিল। গোলমাল থামানই দায়।

আমি যেতে সবাই খাতির করে বসাল। সভা অল্প পরে শুরু হবে। সভাপতি এলেন। তিনি স্থানীয় এক অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তা হল। উদ্বোধনের সময় এসে গেল। সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরতে লাগল। প্রত্যেকে মাতব্বর! দুয়েকজন আর্টিস্ট এসে পড়েছে। তাদের বসানোর ব্যবস্থা হয়েছিল একটা পাশের বাড়ীতে। মিনিট পনের কেটে গেল। প্রসাদকে ডেকে বললুম, 'কি ভাই, আর কত পরে শুরু হবে?'

প্রসাদ বলল, এক্ষুণি ব্যবস্থা হচ্ছে। দেখুন না, এত কর্মকর্তা। কাজের সময় কারুর দেখা নেই। আমাকেই সব দিক সামলাতে হচ্ছে। এই মাইক-ম্যান্, ভাই, এবার ব্যবস্থা কর।'

ফিল্মের গানটা শেষ হতে লাউড-স্পীকার বন্ধ হল। মাইকম্যান্ এবার মাইক নিয়ে পড়ল। ক্যাঁ, কোঁ, ঘর্‌র্‌ঘর্‌র্—নানা আওয়াজের পর মাইকম্যান্ চেঁচাল, 'মাইক টেস্টিং ওয়ান—টু—থ্রি—ফোর...।'

মাইক রেডি। প্রসাদ বলল, 'এবার আপনারা ভায়াসে আসুন।' আমি মঞ্চে উঠলুম। লোক গিজগিজ করছে। মেয়ের দলও বেশ ভারী। এক ঝলকে দেখার চেষ্টা করলুম মালতী আছে কিনা। দূর থেকে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলুম না।

সভার পর্ব আমরা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করলুম। এই হট্টগোলের মাঝে কে আর বক্তৃতা শুনতে চায়?

এবার জলসা শুরু হবে। আমি ডায়াস থেকে নেমে এসে দাঁড়ালুম। প্রসাদ সামনে ছিল। বললুম, 'এবার তবে আসি।'

'তাও কি হয়?' প্রসাদ বলল, 'মিষ্টিমুখ করে যান।' 'আবার কেন?' আমি বললুম।

'সব রেডি আছে,' সে বলল, 'আসুন, আসুন।'

সে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসাল একটা বৈঠকখানায়। বাড়িটায় ঢুকতে গিয়ে মনে পড়ল, সেটা চেনা বাড়ি। বিন্ধ্যবাসিনীর বসতবাড়ি—মালতীদের বাড়ি। আমি একা বসলুম। প্রসাদ বলল, 'একটু বসুন দাদা। এখনই জলযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

বলতে বলতে ঘরে ঢুকল বিন্ধ্যবাসিনী। চেহারা প্রায় আগেরমতই আছে। সে এক হাতে থালা আর অন্য হাতে সরবতের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। থালাভর্তি ভাল ভাল মিষ্টি আর সিঙ্গাড়া।

বিন্ধ্যবাসিনী থালা টেবিলে রাখতেই আমি বললুম, 'এত কেন? এত কে খাবে? কিছু বরং তুলে নিন।'

সে বলল, 'খান, বাবু। এ আর এমন কি? ভাল দোকানের মিষ্টি, ফরমাস দিয়ে তৈরি করা। পেসাদ নিজে কিনে এনেছে'

প্রসাদ মিটমিট করে হাসছিল। আমি অগত্যা খেতে শুরু করলুম। বিন্ধ্যবাসিনী বলল, 'আপনার সঙ্গে কতদিন বাদে দেখা, বাবু। সেই আপনার বাড়িতে গেছলুম। আপনি তো মামলাটা মিটিয়ে দিলেন না।'

'আমার দোষ কি বলুন।' আমি বললুম, 'আমি তো চেষ্টা করেছিলুম। শেষে মামলাটাই ছেড়ে দিলুম।'

'সেই তো ভুল করলেন, বাবু,' বিন্ধ্যবাসিনী বলল, 'আপনার হাতে থাকলে মামলাটা ঠিক মিটে যেত। অনেক ঝড় বয়ে গেল আমাদের ওপর।'

তারপর একটু থেমে সে বলল, 'ঝুনুর আবার একটি বিয়ে দিয়েছি। এবার আর অন্য সমাজে নয়, নিজেদের সমাজেই। বামন হয়ে চাঁদে হাত কি আমাদের সাজে?'

আমি শুনে খুশী হয়ে বললুম, 'বেশ, বেশ, কোথায় বিয়ে দিলেন? কেমন জামাই হল?'

বিন্ধ্যবাসিনী হেসে বলল, 'জামাই এই তো আপনার সামনে দাঁড়িয়ে বাবু। বাবা পেসাদ বাবুকে পেন্নাম কর।'

আমি ঈষৎ অবাক হলুম, প্রসাদ মালতীর স্বামী! তারপর আর অবাক হলুম না। প্রসাদের সঙ্গে বিয়ে হয়ে বোধহয় ভালই হয়েছে। সমানে সমানে। তা ছাড়া প্রসাদ মালতীর খুব কাছের লোক ছিল। এখন অভিন্ন হৃদয় হল।

প্রসাদ লজ্জিত মুখে আমার পায়ের ধুলো নিল। আমি বললুম, 'খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু মালতী কই? তাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

তার মা বলল, 'সে ছাতে পিদ্দিম সাজাচ্ছে। আজ দেওয়ালী তো। সে সারি সারি পিদ্দিম জেলে যাচ্ছে। বাবা পেসাদ, ডেকে আন না ঝুনুকে, বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাক্।'

প্রসাদ চলে গেল।

আমার খাওয়া শেষ হল। মালতীকে বধূরূপে দেখবার জন্যে আমি আগ্রহী। বিন্ধ্যবাসিনী বলল, 'ওরা আমার কাছেই থাকে। এ জামাই আমার খুব ভাল হয়েছে। আশীর্বাদ করুন বাবু, এবার আমার মেয়ে জামাই সুখী হোক্।

'নিশ্চয় আশীর্বাদ করি,' অমি আন্তরিকতার সঙ্গে বললুম।

প্রসাদ একাই ফিরে এল। বিন্ধ্যবাসিনী জিজ্ঞাসা করল, 'কি বাবা পেসাদ ঝুনু কই?'

প্রসাদ বলল, 'সে এল না, বললে দাদার সামনে বেরতে আমার লজ্জা করছে।'

আমার কৌতূহল মিটল না। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। প্রসাদ গাড়ি পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিল। দূর থেকে চেয়ে দেখলুম বিন্ধ্যবাসিনীর বসতবাড়ি—অর্থাৎ মলতীদের বাড়ি দীপমালায় জলজল করছে। দূর থেকে আশীর্বাদ করলুম, মালতীর নতুন জীবনেও যেন চিরকাল এমনই আলো জলে থাকে।

প্রসাদ গাড়িতে তুলে দিয়ে আমাকে বলল, 'দাদা, কাল সকালে আপনি বাড়ি থাকবেন?

আমি বললুম, 'হাঁ, কিন্তু কেন?'

প্রসাদ বলল, 'আমি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করব। কিছু কথা আছে।'

'বেশ, সকাল ন'টা নাগাদ এস।'

পরদিন প্রসাদ, ঠিক সময়েই এল। তার হাতে এক বাক্স মিষ্টান্ন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কেন?'

সে বাক্সটা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'ঝুনু আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিল। বলল, আপনি তো আমাদের বিয়েতে মিষ্টিমুখ করেননি। সেই অপরাধ যেন আপনি মার্জনা করেন।'

'কবে তোমাদের বিয়ে হল?'

'গত আষাঢ় মাসে। সে এক ব্যাপার! মাসীমা, মানে আমার শাশুড়ী বিয়ের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন। একবার ঝুনুর বিয়ে বাতিল হয়ে গেল। আবার বিয়ের কথা তিনি ভাবতেন না। বরং কেউ বললে তিনি ব্যঙ্গ করে বলতেন, 'অতি-বরন্তী না পায় বর, অতি-ঘরনী না পায় ঘর। আমার মেয়ের উঁচুনজর। ও বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়। ভদ্দরলোকের সঙ্গে বিয়ে না হলে রুচিতে বাধবে। আমি এখন ফরমাসি ভদ্দরলোক পাই কোথা? কুমোরটুলি থেকে তো মাটির ভদ্দরলোক গড়ে আনতে পারি না। একবার তো চেষ্টা করলুম। চাষবাস করলে কি হয়, সহদেব ছোকরা ভালই ছিল। কিন্তু মেয়ের কপাল মন্দ। সে বর তার কপালে সইল না।" হারু, মিত্তির তো বিয়ের নাম শুনলেই খিঁচিয়ে উঠত, বলত, 'আবার বিয়ে। অতগুলো টাকা গচ্চা গেল। প্যাজপয়জার দুই-ই হল। আবার বিয়ে! তার চেয়ে ঝুনু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রোজগার করুক। ঐ তো কত লোক আসছে কাজের জন্যে, ঝুনু রাজী হলেই হয়। কিন্তু মেয়েটা যে ভারি একরোখা, জেদী।

আমি বললুম, মালতী বিব্রত হয়ে এসেছিল চাকরির সন্ধানে। কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না।'

প্রসাদ বলল, 'হাঁ সে আমায় সব বলেছে। খবরের কাগজে কর্মখালীর বিজ্ঞাপন দেখে দেখে সে কতকগুলো দরখাস্তও ছেড়েছিল। দু-চার জায়গা থেকে ইণ্টারভিউ-এর চিঠি আসে। কিন্তু কোথাও কোনও চাকরি হল না।'

আমি বললুম, 'কয়েকজনকে আমিও বলেছিলুম উপযুক্ত কাজের জন্যে, কিন্তু হল না।'

প্রসাদ বলল, সে ওষুধের ক্যানভাসারি কাজ একটা পেয়েছিল, মাইনে কম, বিক্রীর ওপর কমিশন, ঘুরতে হবে খুব, খাটুনি অনেক। আমি বললুম, "ও কাজ তুমি নিও না, ঝুনু। দুদিনে রোগে পড়বে।" সে খুব মানসিক অশান্তিতে ভুগছিল। সে কেঁদে ফেলল। বলল, "এখন আমি করি কি?

আমি সান্ত্বনা দিলুম। বললুম। "যা করছ তাই কর। প্রাইভেট স্কুল ফাইনাল দাও, কলেজে ভর্তি হও তারপর দেখা যাবে।" ঝুনু চলে গেল। বেশ কদিন আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

'একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে,' প্রসাদ বলে চলল, আমি দোকানে আছি। রাস্তায় জল জমে গেছে। খদ্দের নেই, ছকুটাও আসেনি বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছি। হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হল ঝুনু। ঐ বৃষ্টিতে ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছে। ভিজে শপশপ করছে শাড়ি। ময়লা জল ভেঙে হাজির হল সে। আমি তো অবাক্! ঝুনু বলল, "বাড়িতে তিষ্ঠতে পারলুম না, প্রসাদদা। তাই পলিয়ে এলুম।" আমি বললুম, "খুব বীরত্ব করেছ, একটা ছাতাও আনতে পার নি? ভিজে অসুখ বাধাবে যে।" সে কাতর হয়ে বলল, "তাতে কার কি এসে যায়? মরলেই তো বাঁচি।" আমি আবহাওয়া সরল করবার জন্যে বললুম, "এর মধ্যেই অকাল-বৈরাগ্য? ঝুনু কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার কেউ নেই, প্রসাদদা, কেউ নেই। মা, নির্বিকার, নিজের ভাড়াটে ঠেঙিয়ে টাকা রোজগারে ব্যস্ত। আর বাপ বলে যে পরিচয় দেয়, সে একটা বিচ্চু। মা কিছু না বলায় ইদানীং সে মাথায় উঠতে চায়। আজ আমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল, বলে কি, "নবাবনান্দনী গদিতে শুয়ে বসে আর গেলা চলবে না। এখন ভরা যৌবন, এখনি রোজগারের বয়স। রোজগার কর, খাও। নয় তো—"

ঝুনু রেগে বলল, "আমি তোমার পয়সায় খাচ্ছি? আমার নিজের বাবা যা রেখে গিয়েছেন, তা থেকেই তো খাচ্ছি।" হারু মিত্তির খারাপ গালিগালাজ দিয়ে বলল, "তোর কোন্ বাপ কত রেখে গিয়েছিল, হারামজাদি? তোর শখের সাদির পেছনে এত টাকা গাঁটগচ্চা গেল, সে হিসেব রাখিস?" ঝুনু বলল, "মাকে গিয়ে বলছি সব।" হারু মিত্তির বলল, "বল্ না রে হতচ্ছাড়ি। তোর মা এখন আমার মুঠোর মধ্যে। সে সমস্ত ঘরবাড়ি আমায় উইল করে লিখে দিয়েছে। আমি না তদারক করলে সে খেতে পাবে না। যেদিন বলব, সেদিন সে দানপত্তর করে দেবে সব বিষয় আমার নামে।" ঝুনু বলল, "চাই না তোমাদের পাপের বিষয়। এর পরই সে রাগ করে ভিজতে ভিজতে আমার দোকানে চলে এল।'

'মালতি সত্যিই তো খুব বিপদে পড়েছিল! আমি বললুম, 'তারপর কি হল?'

বৃষ্টি থেমে গেল,' প্রসাদ বলল, 'আমি তৃপ্তি কাফে থেকে চা আনতে গেলুম। গরম চা খেলে ঝুনু নিশ্চয় আরাম পাবে। চা নিয়ে ফিরে এসে দেখি, ঝুনু মাথাটা শুকনো কাপড়ে মুছে ফেলেছে। কিন্তু ভিজে কাপড় ছাড়েনি। ঐ অবস্থায় একটা ময়লা কাপড়ের গাঁটরির ওপর বসে সে গুণগুণ করে গান গাইছে। রবি-ঠাকুরের গান। কথাগুলো মনে আছে, কারণ ঐ কথাই আমাদের দুজনকে কাছাকাছি এনে দিল।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুল, 'কি গান?'

'ঐ মালতীলতা দোলে পিয়াল তরুর কোলে—' প্রসাদ বলল।

আমি হেসে প্রশ্ন করলুম, 'পিয়ালতরুটি কে?

প্রসাদ বলল, 'আমারও সেই প্রশ্ন ছিল ঝুনুর কাছে। আমি রহস্য করে তাকেও ঐ প্রশ্ন করেছিলুম। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সে মুচকি হেসে বলল, 'আমার পিয়ালতরু তুমি, প্রসাদদা।' "তার মানে?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। ঝুনু আগ্রহের সঙ্গে হঠাৎ আমার হাত ধরে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে, প্রসাদদা? তুমি আমায় বিয়ে কর, বিয়ে কর। আমার কেউ নেই, প্রসাদদা। তুমি আমায় বাঁচাও।' আমার ব্যাপারটা ভারি মজার লাগল। যাকে আমি ছেলেবেলা থেকে একতরফা ভালবাসি, সেই মেয়েটি ভিজে কাপড়ে একটা ময়লা কাপড়ের গাঁটরির ওপর বসে ধোপার দোকানে শুধু প্রেম নিবেদন করছে না, আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে, উৎসর্গ করছে! আমি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলুম। ঝুনু যেন আহত হল, বলল, "হাসছ যে? আমায় উপহাস করছ?" "আমি তাড়াতাড়ি বললুম, "না ঝুনু, না। নিশ্চয় আমি তোমায় বিয়ে করব। একেবারে রাজযোটক। খানকির ছেলের সঙ্গে খানকির মেয়ের বিয়ে! বেজন্মার সঙ্গে বেজন্মার। সমানে সমানে সাদি।' ঝুনু আশ্বস্ত হয়ে বলল, "ঠিক বলেছ, প্রসাদদা। সমানে সমানে। কিন্তু একটি অনুরোধ করতে পারি কি?" আমি বললুম, "বল, বল।" ঝুনু বলল, "তুমি এক পয়সাও যৌতুক চাইবে না।" আমি বললুম, "কিছু চাই না, আমি শুধু তোমায় চাই; তোমায় চাই; তোমায় আমি বরাবর চেয়ে এসেছি। মাসীমাকে বলি, চল।" ঝুনু বলল, "না। ওদের কিছু জানাব না। আমরা কালীঘাটে লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করব। দরকার মনে কর তো বিয়ে রেজিস্টিও করতে পার।" ঝুনুর কথা মতো আমরা লুকিয়ে বিয়ে করলুম। অবশ্য কিছু বরযাত্রী

কন্যাযাত্রী ছিল। তারা হল ঘণ্টে, ঝটু, ভোম্বা, যেদো, হিট্‌লার আর নেপো—নেপোলিয়ান—।'

আমি বললুম, ওদের পরিচয় জানি।'

'বিয়ের রেজিষ্ট্রি আফিসে ভোম্বা আর নেপোলিয়ান সাক্ষী হল। সবাই মিলে একটা হোটেলে ফিস্ট করলুম।'

'তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী এ বিয়ে মানলেন ?' আমার প্রশ্ন।

প্রসাদ বলল, 'না মেনে আর করেন কি ? মেয়ের সঙ্গে আর কত মনোমালিন্য করেন মাসীমা—মানে আমার শাশুড়ী ? তিনি বললেন, "একটিমাত্র সর্তে আমি এ বিয়ে মানতে পারি। মেয়েজামাইকে আমার ঘরে থাকতে হবে।" আমি কিছুতেই ঘরজামাই হতে চাই না। কিন্তু ঝুনুর কথায় আমি রাজী হলুম, "আমি শ্বশুরবাড়ি থাকব, কিন্তু আমাদের দু'জনের খাইখরচা আমি দেব।" আমার ধোপিখানা থেকে যা আয় হয়, তাতে দু'জনের হেসেখেলে চলে যায়।'

'তোমার শাশুড়ীর মত তো জানলুম, হারু মিত্তির কি বললে ?'

'তিনি আর কি বলবেন ? যেদিন আমার শাশুড়ী উইল বদলে সব সম্পত্তি ঝুনুর নামে লিখে দিলেন, সেদিন থেকে হারু মিত্তির মশায় শয্যা নিলেন। তাঁর বাত বেড়ে গেল, তিনি বাড়িভাড়া আদায় করেন না। আমরা আর ঘাঁটালুম না। তিনি বসে বসে খাচ্ছেন আর শাশুড়ীর কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ প্যান্‌প্যান্‌ করছেন ; আর ভাড়াটেদের সামলাচ্ছি আমি আর ঝুনু।

বুঝলুম মলতী আমার সঙ্গে কেন লজ্জায় দেখা করল না। এ লজ্জা শুধু মালতীর নয়, আমারও।

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীর অনেক দিন লুপ্ত হয়েছে, নেই ঋষি গৌতম, হারিয়ে গেছে সত্যকাম জাবাল। কিন্তু আছে জাবালা, আছে বিশ্বের আদিমতম পেশা—আর বোধহয় থাকবেও। ওরা অমর, অজর।

—: সমাপ্ত :—